অঙ্কুর বর

ঘরটা পুরোপুরি অন্ধকার নয়। ঘরের এককোণে টিমটিম করে বিলিতি ধারার একটা লণ্ঠন জ্বলছে, তারই ঘষা, আবছা কাচ ভেদ করে যেটুকু আলো বাইরে প্রতিফলিত হচ্ছে, তাতে ঘরের অবস্থা কিছুটা হলেও দৃশ্যমান। ঘরের দেওয়াল, মেঝে, ছাদ সব কাঠের। খানিকটা ইংরেজ স্থাপত্যের আদলে গড়া ঘরটার জানালার শার্সি বেয়ে নীলাভ সাদা জ্যোৎস্নার আলো কিছুটা কাঠের মেঝেতে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই আবছা আলোয় দেখা গেল ঘরের একধারে একটা খাট আর তাতে বিছানা এলোমেলো করে রাখা। দেখে মনে হয়, কেউ যেন বিছানা ছেড়ে এখনই উঠে গেছে।

এমন সময় ঘরের বাইরের কোথাও একটা ঘড়িতে ঢংঢং করে দুটোর ঘণ্টা বেজে উঠতেই হুড়মুড় করে ঘরের দরজা খুলে কেউ একজন ঘরের মধ্যে ঢুকল। তারপর সশব্দে দরজাটা লাগিয়ে ভেতর থেকে ছিটকিনি তুলে প্রবলভাবে হাঁপাতে লাগল। আবছা আলোয় বোঝা গেল, যিনি ঢুকলেন, তিনি মহিলা। পরনের পোশাক সম্পূর্ণ এলোমেলো। চেহারায় বিধ্বস্ত ভাব। ঘামে ভিজে সপসপ করছে সারা শরীর। দেখে মনে হচ্ছে, কোনো কিছু দেখে এই মহিলা ভীষণ ভয় পেয়েছেন। সারা মুখের আতঙ্ক সেই কথাই প্রমাণ করছে। কিন্তু কী দেখে এত ভয় পেলেন এই মহিলা?

মহিলা একটু দম নিয়ে খুব ধীরে ধীরে প্রায় শব্দ না করে দরজার কাছ থেকে সরে এলেন। তারপর প্রায় আরও ধীরে ধীরে একপাশে রাখা পড়ার টেবিল থেকে লণ্ঠনটা তুলে দরজার সামনের কাঠের মেঝেতে নামিয়ে বিপরীতদিকের দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে উবু হয়ে বসলেন। দু-হাত দিয়ে মুখটা এমনভাবে চেপে ধরলেন, যাতে হাঁপানির শব্দটুকুও ঘরের বাইরে না যায়। মুখের সামনে জ্বলতে-থাকা লণ্ঠনের আবছা আলো মেয়েটির ভয়-পাওয়া মুখের ওপর পড়ছে। সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে,

মেয়েটি বিস্ফারিত নয়নে সেই বন্ধ দরজার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

"খিকখিক..."

আচমকা বন্ধ দরজার বাইরে কারও হাসির শব্দ আর তারপরেই কাঠের মেঝের ওপর দিয়ে কারও দৌড়ে পালানোর শব্দ। মেয়েটা আতঙ্কে আরও শিউরে উঠল। দরজার ওপারে দাঁড়িয়ে কেউ একজন হাসছে। কে হাসছে এত রাত্রে? মেয়েটাই বা এত ভয় পাচ্ছে কেন?

ক্যাঁচ।

ঘরের ভেতরে কেঠো আওয়াজটা ছড়িয়ে পড়তেই প্রবল আতঙ্কে ছিটকে উঠে দাঁড়াল মেয়েটা। বিস্ফারিত নয়নে সে দেখল, যে দরজাটা সে একটু আগে নিজের হাতে বন্ধ করেছিল, সেটা একটা বিশ্রী কলকব্জার আওয়াজ করতে করতে আপনা থেকেই মুখের সামনে খুলে যাচ্ছে। দরজাটা পুরোপুরি খুলে গিয়ে একটা শীতল হাওয়ার স্রোত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতেই লণ্ঠনের জ্বলতে-থাকা ক্ষীণ বাতিটা ভয়ংকরভাবে কেঁপে উঠল।

দরজার বাইরে একটা সরু করিডর। একটু আগেও দেওয়ালের গায়ে লণ্ঠনের আলো জ্বলছিল, কিন্তু সেখানে এখন ঘন অন্ধকার। আলোগুলো যেন নিভে গিয়েছে অদৃশ্য মন্ত্রবলে। ভেতর থেকে ভালো বোঝা যাচ্ছে না কে আছে দরজার বাইরে। ঠিক এমন সময় দরজার বাইরের অন্ধকার করিডরে আবার সেই খিলখিলে হাসি। আর তারপরেই অন্ধকারে কারও একটা দৌড়ে পালানোর শব্দ।

মেয়েটার বুক হাপরের মতো ওঠানামা করছে। সে এই মুহূর্তে এই ঘর ছেড়ে পালাতে চায়। কিন্তু কীভাবে পালাবে? ঘরের বাইরেই তো হাসিটা ওঁত পেতে আছে...

এসবই ভাবছে আর ঠিক তখনই অন্ধকার করিডোরের মধ্য দিয়ে কেউ যেন কিছু একটা ছুড়ে দিল মেয়েটির পায়ের কাছে। লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোয় মেয়েটি অবাক চোখে দেখল, একটা কাগজের বল তার পায়ের কাছে পড়ে আছে আলগোছে।

মেয়েটি ভয়ার্ত চোখে আবার তাকাল অন্ধকারের দিকে। তারপর কোনরকমে হাঁটু মুড়ে বসে কাঁপতে-থাকা হাতে লণ্ঠনের আলোয় কাগজের বলটা খুলে মেলে ধরতেই ঘাড়ের এক-একটা লোম আপনা থেকেই খাড়া হয়ে গেল শীতল আতঙ্কে।

ক্ষীণ হলদেটে আলোয় মেয়েটি দেখল, কেউ খুব কাঁচা হাতে লিখেছে তিনটে শব্দ—'দেখতে পেয়ে গিয়েছি!'

আর তারপরেই ঘরের ভেতর জ্বলতে-থাকা একমাত্র লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোটাও দপ করে নিভে গেল। আতঙ্কিত মেয়েটা এক মুহূর্ত দেরি না করে পড়িমরি করে ছুটে গেল খোলা দরজার দিকে। এই দরজাটা এক্ষুনি বন্ধ করা দরকার। কিন্তু সে যেই ডান হাতটা বাড়িয়ে দরজাটা লাগাতে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্তেই বাইরে থেকে কে যেন আটকে দিল দরজার পাল্লাটা। অন্ধকারেই আঁতকে উঠল মেয়েটা। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল গোঙানির মতো একটা আওয়াজ। কারণ আবছা আলোয় মেয়েটা ততক্ষণে দেখতে পেয়েছে, দরজা আর চৌকাঠের অবশিষ্ট ফাঁক থেকে একটা কালো হাত ধীরে ধীরে ঘরের ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে। মেয়েটা সঙ্গে সঙ্গে শরীরের সমস্ত শক্তি জড়ো করে দরজার অবশিষ্ট ফাঁকটুকু বন্ধ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে কই? কোনো এক আসুরিক শক্তি উলটোদিক থেকে কিছুতেই দরজাটা বন্ধ হতে দিচ্ছে না। ঠিক এমন সময়ই দরজার সেই অল্প ফাঁক থেকে সাপের মতো শীতল হিসহিসে স্বরে কেউ একজন বলে উঠল, 'ধা...প্পা!'

আর তারপরেই সেই বুকের রক্ত-জল-করা খিলখিলে হাসি। ব্যাস! তারপরেই মেয়েটির আর কিছুই মনে রইল না।

* * * * * * * *

আলোলিকা যেখানে বসে আছে এই মুহূর্তে, সেখান থেকে জানালার বাইরেটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দিগন্তবিস্তৃত ঢেউখেলানো উঁচুনিচু রুক্ষ ভূমি। রুক্ষ ভূমির মাঝেমধ্যেই নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে-থাকা পাথুরে শিলার। দু-একটা পলাশ গাছ সেই ঢেউখেলানো রুক্ষ ভূমিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে বটে, তবে তার ছায়া প্রায় না-থাকার মতোই। বেশির ভাগই গুল্মজাতীয় ঝোপঝাড়। তাদের পাতাও শুকিয়ে রুক্ষ খয়েরি বর্ণ ধারণ করেছে। সময়টা ডিসেম্বরের মাঝামাঝি তাই জানালার বাইরের রোদের ওমটা এখন বোঝা যাচ্ছে না, তবে গরমকালে যে বেশ ঝক্কি পোহাতে হবে এখানে, সেটা সে বেশ বুঝতে পেরেছে। খাতায়-কলমে জায়গাটার নাম হুরা। একেবারে পুরুলিয়া-বাঁকুড়া জেলার সীমান্তে। দিগন্তরেখার ওপারে দূরের একটা নীলচে উঁচু পাহাড়ের রেখা চোখে পড়ছে এখানে বসেই, ওটাই কি সাগেন পাহাড়? কে জানে?

আচমকা জানালার বাইরে কী একটা চোখে পড়তেই সোজা হয়ে বসল আলোলিকা।

রুক্ষ জমির বুক চিরে ক্রমশ দিগন্তে মিশে গিয়েছে একটা লাল মোরামের রাস্তা। এখন সেই রাস্তার লাল মোরামের ধুলো উড়িয়ে ক্রমশ এগিয়ে আসছে একখানা গাড়ি। এই গাড়িই একটু আগে তাকে এখানে নামিয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে

প্রায় ঘণ্টাখানেক হয়ে গেল, এখানেই সে অপেক্ষা করছে। মাঝে একজন লোক, দেখে স্থানীয় বলেই মনে হল, এসে এক কাপ চা রেখে গিয়েছে বটে, কিন্তু তারপর থেকে সে একলাই বসে রয়েছে এখানে। আবার কেউ আসছে নাকি?

আলোলিকা চোখ সরিয়ে ঘরের চারপাশে তাকাল। আপাদমস্তক কাঠের তৈরি এই কামরাটি, খানিকটা অফিস কেবিনের গোছে সাজানো। ভারী ভারী কাঠের তৈরি চেয়ার-টেবিল, কাচ-লাগানো আলমারি গৃহকর্তার আভিজাত্যের নিদর্শন বহন করলেও সামনের টেবিলের একপাশে ডাঁই হয়ে-থাকা কাগজপত্র ও বইয়ের তাকে ঈষৎ ধুলোর আস্তরণ অযত্নের সাক্ষ্যও বহন করে একই সঙ্গে। আলোলিকা গায়ের শালটা ভালো করে জড়াতেই দেখল, এই কামরারই মেঝের ওপর একপাশে একটা টিনের রংচটা তোরঙ আর একটা কাপড়ের ব্যাগ রাখা আছে। এই দুটো তার সামগ্রী। কাপড়ের ব্যাগে তার পরিধানের পোশাক রয়েছে কিছু। আর টিনের তোরঙে তার বইপত্রসহ আরও টুকটাক কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস। গাড়োয়ান কখন যে এগুলো গাড়ি থেকে নামিয়ে এখানে রেখে গিয়েছিল, সে খেয়াল করেনি।

আলোলিকার পুরো নাম আলোলিকা রায়। দেশের বাড়ি কৃষ্ণনগর। ছোটোবেলা থেকেই পিতৃহীনা আলোলিকা কষ্টে মানুষ। মা কোনোরকমে সেলাইয়ের কাজ করে সংসার আর আলোলিকার পড়া—দুটোই টিকিয়ে রেখেছিলেন, কিন্তু বছরখানেক আগে আচমকা রাতে বুকের ব্যথায় তিনিও গত হন। তারপর থেকে অনাথ আলোলিকা পড়ে অকূল পাথারে। অনেক চেষ্টা করে দু-একটা টিউশনি জোগাড় করে কোনোরকমে জোড়াতাপ্পি মেরে জীবন অতিবাহিত হলেও সে খুব তাড়াতাড়িই বুঝতে পারে, বেঁচে থাকতে গেলে তাকে একটা কাজ যেনতেনপ্রকারেণ জোগাড় করতে হবে। কিন্তু বললেই তো আর কাজ জোগাড় হয় না। একেই কৃষ্ণনগরে এসবের সম্ভাবনা কম। তা ছাড়া এই বয়সি মেয়ে বিয়ে না করে কাজ খুঁজছে হন্যে হয়ে, সেটা যে অনেকেই ভালো চোখে দেখছে না, সেটা একাধিকবার টের পেয়েছে আলোলিকা।

আসলে মাথার ওপর যতদিন মা ছিল, ততদিন মা-ই পুরো ব্যাপারটা সামলাত, কিন্তু আচমকা সেই ছাতাটা সরে যাওয়ায় বাস্তবতার চড়া রোদ যেন তাকে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলতে চাইছে। তারপরেও কয়েকদিন সে চেষ্টা করেছে কিছু বাড়িতে আয়ার কাজ করতে, কিন্তু সেখানেও খুব একটা যে সফল হতে পেরেছে তা নয়। ঠিক এমনই এক অর্থকষ্ট আর মানসিক বিচলতায় সে যখন জর্জরিত, ঠিক সেই সময় তার চোখে পড়ে একটি কর্মখালির বিজ্ঞাপন।

'পুরুলিয়া জেলার হুরা হইতে আরও পূর্বদিকে ১৫ কিলোমিটার দূরত্বে প্রায় বাঁকুড়া-পুরুলিয়া সীমান্তের কাছাকাছি মনোরম, নির্জন পরিবেশে একটি অনাথ আশ্রমের বাচ্চাদের দেখভাল আর পড়াশুনার দায়িত্ব নিতে পারবে এমন একজন পিছুটানহীন শিক্ষিকা কাম কেয়ারটেকার আশু প্রয়োজন। যোগ্যতা স্কুল ফাইনাল, আন্তরিকতার সঙ্গে অনাথ বাচ্চাদের দেখাশোনা করার অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার প্রাপ্য। বেতন আকর্ষণীয় না হলেও খারাপ নয়। থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত রয়েছে।'

বিজ্ঞাপন দেখে কালব্যয় করেনি আলোলিকা। সঙ্গে সঙ্গে চাকরির আবেদন করে চিঠি দিয়েছিল উক্ত ঠিকানায়। উত্তরও পেয়েছিল মাসখানেকের মধ্যেই। চাকরিটা তার হয়েছে। আলোলিকা খুব একটা আশাবাদী ছিল না চাকরিটা পাওয়া নিয়ে। রেজাল্ট যে তার খুব একটা ভালো তা-ও নয়। তার ওপর সে খুব একটা বাচ্চাদের পছন্দও করে না। সামান্য কয়েকটা টিউশনিতেই তার বিরক্তি চরমে উঠত। সেখানে এই ধরনের একটা জায়গায়, দিনরাত অতগুলো বাচ্চার সঙ্গে থাকতে হবে ভেবেই যে তার অনীহা জন্মায়নি তা কিন্তু নয়। কিন্তু ওই যে কথায় আছে না, পেটের দায় বড়ো দায়।

এক বছর আগে হলে সে এই চাকরিতে আবেদনটুকু করত কি না তা-ও বড়ো প্রশ্ন ছিল। কিন্তু এই এক বছরে খিদে, অভাব আর সমাজের ক্লেদ-মাখা সবচেয়ে ঘৃণ্যতম নগ্নরূপ সে দেখে ফেলেছে। তাই আবেদনের সময় সে বাচ্চাদের প্রতি কতটা সহনশীল, স্নেহশীল আর বাচ্চা প্রতিপালনে যে তার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা আছে তা বাড়িয়ে, রং চড়িয়ে লিখতে ভোলেনি। সে বুঝেছিল, এই চাকরিটা তাকে যে-কোনো মূল্যেই হোক পেতেই হবে। কৃষ্ণনগরে এমনিতেও তার জন্য অবশিষ্ট কিছুই ছিল না। তাই শিকড়ের টান কাটাতে খুব একটা অসুবিধে হয়নি।

চিঠিতেই তার হুরা আসার টিকিট পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে এ-ও বলা ছিল, আদ্রা স্টেশনের বাইরে তার জন্য গাড়ি অপেক্ষা করবে। আদ্রা থেকে হুরা প্রায় বাইশ কিলোমিটার পথ, তারপর হুরা ছাড়িয়ে আরও পনেরো কিলোমিটার। এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আলোলিকা যথেষ্ট বিধ্বস্ত, কিন্তু সেটা জাহির করা চলবে না। বরং ঠোঁটের কোলে একটা মেকি হাসি ঝুলিয়ে রেখেছে এখানে আসা থেকেই। এখন এই জনমানবহীন কক্ষেও সেই মেকি প্রসন্ন ভাব ধরে রেখেছে সে।

একটা ভারী পায়ের শব্দে চমক ভাঙল আলোলিকার। ঘরের

দরজায় দেখা গেল একজন মহিলাকে। লম্বা রোগা শীর্ণ চেহারার বৃদ্ধার মুখটা বেশ লম্বা। তীক্ষ্ণ নাকের পাশে একটা বড়ো কালো আঁচিল। চোখে বাদামি ফ্রেমের মোটা চশমা। পরনে হালকা রঙের সুতির শাড়ির ওপর সাদা রঙের ফুলহাতা সোয়েটার। মাথায় কান-ঢাকা একটা সাদা-কালো ছাপের রুমালের আড়াল থেকে বেরিয়ে-আসা কাঁচাপাকা চুল জানান দিচ্ছে মহিলার যৌবন বিগতপ্রায়।

"আলোলিকা রায়?"

মহিলাটির চেহারা ক্ষয়িষ্ণু হলেও হাবেভাবে বেশ একটা নেতৃত্বের ব্যাপার রয়েছে।

আলোলিকা নমস্কার করে উঠে দাঁড়ানোর সময় খেয়াল করল মহিলার স্বরটা একটু অন্যরকম। খানিকটা কাঠের ওপর শিরীষ কাগজ ঘষলে যেমন শব্দ পাওয়া যায়, ঠিক তেমনই। মহিলা হাতের ইশারায় তাকে বসতে বললেন।

"আমার নাম মালা সাঁতরা। আপাতত এই সারদামণি অনাথ আশ্রমের কাজকর্ম আমিই দেখি। তা, নিশ্চয়ই ক্লান্ত আছেন এতটা পথ জার্নি করে?" মহিলার প্রশ্নের উত্তরে আলোলিকা কিছু বলতে যাবে, তার আগেই মহিলা ফের বলে উঠলেন, "হওয়াটাই স্বাভাবিক। এতটা পথ। আপনাকে বেশিক্ষণ বসাব না, তবে কিছু দরকারি কথা বলে দিই।"

মহিলা চশমার ওপর থেকে তাকালেন আলোলিকার মুখের দিকে। তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে বলে উঠলেন, "আপনি নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছেন এরকম প্রত্যন্ত এলাকায় হঠাৎ জেগে-ওঠা এই পেল্লায় সাইজের বাড়ি দেখে। আসলে এই বাড়িটা আগে ছিল এক ব্রিটিশ অফিসারের। ভারত স্বাধীন হওয়ার পরেও কিছু অফিসার এ দেশেই থেকে যান এ দেশকে ভালোবেসে। এ সাহেব ছিলেন তাঁদেরই মতো একজন। গরমকালে এসব অঞ্চলে থাকা যায় না, কিন্তু শীত আর বসন্তকালে প্রকৃতি এখানে বেশ মনোরম। ভদ্রলোক মূলত ছুটি কাটানোর জন্য বাড়িটা বানালেও, পরের দিকে সস্ত্রীক তাঁরা এখানেই বসবাস করতে শুরু করেন। বার্ধক্যজনিত কারণে সাহেব একটা সময় পরে মারা গেলে, সাহেবের স্ত্রী তার পরেও দীর্ঘ সময় বেঁচে ছিলেন।

"একটা সময় তিনি টের পেলেন, এই অঞ্চলে সন্তান হতে গিয়ে বহু মহিলা মারা যেত সঠিক চিকিৎসার অভাবে। তখন তাদের পরিবার সেই বাচ্চাটিকে অপয়া বলে গ্রহণ করত না, বাচ্চা হয়ে যেত অনাথ। এসব দেখেই আর সময় কাটানোর জন্য তিনি এই বিরাট বাড়িটাকে অনাথ আশ্রম হিসেবে গড়ে তোলেন। মহিলা খ্রিস্টান হলেও শেষ বয়সে শ্রীশ্রীমায়ের দীক্ষা গ্রহণ করেন। এখনও ওঁর তৈরি ট্রাস্ট থেকেই অনাথ আশ্রমের খরচ মেটানো হয়। আপনার কিছু জানবার থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারেন।" শেষের কথাটা আলোলিকাকে উদ্দেশ করে।

"এখন কজন বাচ্চা আছে এখানে?"

"ছয়জন। দুজন ছেলে, চারজন মেয়ে। ওই সাত থেকে বারোর মধ্যেই সকলের বয়স। সবার দেখাশোনার দায়িত্ব কিন্তু আপনাকেই নিতে হবে।"

"এখানে আর কে থাকে?"

"কেউ না।"

চমকে অবাক চোখে তাকাল আলোলিকা। "কেউ না?"

"না, কেউ থাকে না। পাশের গ্রাম থেকে একটা ছেলে আসে। নাম রাজেন মান্ডি। সারাদিন সে-ই থাকে। বাগান কোপানো, চারিদিক পরিষ্কার রাখা, ঘর গোছানো, রান্না—সব সে-ই দেখে। তবে সে সারাদিন থাকলেও রাতের বেলা থাকে না।"

কথাটা বলে কয়েক মুহূর্ত থামলেন মহিলা, তারপর অদ্ভুত স্বরটা আরও রহস্যময় করে বলে উঠলেন, "আসুন আমার সঙ্গে।" কথাটা বলেই মহিলা উঠে দাঁড়ালেন, আর আলোলিকা তার পিছু নিল।

"দেখুন, আপনাকে কিছুই লুকোব না। আমাদের বাচ্চারা যথেষ্ট বুঝদার, আর ভীষণ সাহসীও। ওদের দেখাশোনার জন্য সত্যি আমাদের কাউকে নিয়োগ করার দরকার ছিল না। সারাদিন রাজেন থাকে। আর রাতের বেলা দরজা বাইরে থেকে লাগিয়ে রাজেন চলে যায়। আমি কোনো দরকার পড়লে বা সপ্তাহে একদিন আসি। তাতেই কাজ চলে যাচ্ছিল। কিন্তু সত্যি বলতে কী, দিনকাল যা পড়েছে, তাতে ওই ট্রাস্টের টাকায় খরচ কুলিয়ে ওঠা সম্ভব হচ্ছিল না। তাই আমরা সরকারের কাছে অনুদানের আবেদন করি। ওরা জানায়, এই আবেদনের ফলে ওরা ইন্সপেকশনে আসবে। অনাথ আশ্রমের পরিকাঠামো ঠিকঠাক আছে কি না খতিয়ে দেখবে। আর সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে তবেই আমাদের অনুদান মঞ্জুর হবে।

"এবার এমন একটা অনাথ আশ্রমকে সরকার কেন দেখবে, যাতে বাচ্চাদের সারাদিন, সারারাত দেখাশোনার কেউ নেই। বরং এটা জানতে পারলে আমাদের অনাথ আশ্রম সিল হয়ে পারে। তাই তড়িঘড়ি আপনাকে নিয়োগ করা হল। এবার দেখুন, আমারও বয়স হচ্ছে। আর আশ্রমের মেয়েরাও ধীরে ধীরে বড়ো হচ্ছে। অনেকদিন ধরে আমার ভাবনাতেই ছিল যে কাউকে রিক্রুট করতেই হবে। কিন্তু সেটা এত তাড়াতাড়ি

করতে হবে ভাবিনি। এর আগেও একজন এসেছিলেন, কিন্তু ব্যক্তিগত কারণে উনি কাজটা ছেড়ে দেন। আপনি আপনার কাজটা ঠিকঠাক পালন করলে রয়ে যাবেন এখানেই। আশা করি, পুরো ব্যাপারটাই বুঝতে পেরেছেন।"

অফিস থেকে বেরিয়ে ডানদিকে এগোতেই একটা বড়ো ড্রয়িং রুম। চামড়ার গদি-দেওয়া সোফা, মাথার ওপর ঝাড়বাতি, সুন্দর আসবাব সব ব্রিটিশ আমলের নিদর্শন বহন করছে। ড্রয়িং রুমের একপাশের একটা কাঠের রেলিং-দেওয়া সাহেবি কায়দার চওড়া সিঁড়ি দোতলায় উঠে গিয়েছে।

আলোলিকা মহিলার পিছুপিছু দোতলায় উঠে আসতেই দেখতে পেল, প্যাঁচানো সিঁড়িটা এসে মিশেছে একটা চওড়া বারান্দার মুখে। বারান্দার একপাশে কাঠের রেলিং দেওয়া। রেলিং-এর গা ঘেঁষে দাঁড়ালেই একতলার ড্রয়িং রুমটা ওপর থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। রেলিং-এর উলটোদিকে দোতলার সেই বারান্দার গা ঘেঁষাঘেঁষি করে একাধিক ঘর।

"বাচ্চাদের সঙ্গে আপনার পরিচয়টা হয়ে যাওয়া দরকার।"

কথাটা বলেই মালাদেবী দেওয়ালে ঝুলতে-থাকা একটা ছোটো ঘন্টি ধরে নাড়া দিতেই দোতলার বারান্দা জুড়ে টুংটাং করে একটা মিষ্টি শব্দ ছড়িয়ে পড়ল।

"রাতের বেলা কোনো দরকার পড়লে অনেক সময় ওরা এই ঘন্টিটা বাজায়। এটা খেয়াল রাখবেন।" কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। আর তারপরেই শোনা গেল দরজা খোলার শব্দ। পরপর তিনটে ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল ছয়জন ছেলেমেয়ে। তারা মহিলাকে দেখতে পেয়েই কোনো শব্দ না করে বারান্দার একপাশে পরপর লাইন দিয়ে দাঁড়াল।

মহিলাটি গলা খাঁকরিয়ে বাচ্চাদের উদ্দেশে বলে উঠলেন, "এই হল তোমাদের নতুনদিদি। উনি আজ থেকে তোমাদের সঙ্গে থাকবেন। কেমন?"

"রাতেও?" দলের মধ্যে যে মেয়েটি সবচেয়ে বড়ো, সে অবাক গলায় প্রশ্নটা করতেই মালাদেবী মাথা নাড়ালেন।

"হ্যাঁ, রাতেও। সবসময় উনি যা বলবেন তা-ই করবে। সবসময় দিদির কথা মেনে চলবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত দিদিকে বিরক্ত করবে না।"

আলোলিকা বুঝতে পারল না মহিলা বাচ্চাদেরকে তার পরিচয় দিলেন নাকি এক ধরনের প্রচ্ছন্ন নির্দেশ দিলেন।

"ও হল মিলি, ওর পাশে রত্না, আর ও হল শ্যামা।" মালাদেবী তিনটে মেয়েকে দেখিয়ে বললেন, "ওরা এক ঘরে থাকে। ওদের পাশে সঞ্জয় আর বিমল। ওরা এক ঘরে থাকে।" কথাটা শেষ করেই তিনি একটি বাচ্চা মেয়ের দিকে আঙুল তুলে বললেন, "ও হল রিমি। ও ওই ডানদিকের ছোটো ঘরে থাকে।"

"একলা?"

"হ্যাঁ।"

আলো এগিয়ে এল সব থেকে ছোটো মেয়েটির একেবারে কাছে।

"বাহ্, তুমি তো খুব সাহসী। একলা একলা থাকো?" কথা বলতে বলতেই আলোলিকার হঠাৎ করে মনে পড়ল, ভ্যানিটি ব্যাগে একটা না-খাওয়া চিপসের প্যাকেট পড়ে আছে। ট্রেনে কিনেছিল খাবে বলে, তারপর আর খাওয়া হয়নি।

আলোলিকা ব্যাগ হাতড়ে চিপসের প্যাকেটটা মেয়েটার দিকে বাড়িয়ে বলল, "এই নাও। এটা তোমার। তুমি ভীষণ সাহসী। এটা তোমার সাহসিকতার পুরস্কা..."

কথাটা শেষ করবার আগেই আলোলিকা টের পেল, রিমি বলে মেয়েটি আচমকা তার মুখের থেকে চোখ সরিয়ে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তারই মাথার পেছনে তাকিয়ে আছে। আলোলিকা অবাক।

"রিমি...?" মেয়েটি একবার আলোলিকার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার তার মাথার পেছনদিকে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। কী দেখছে মেয়েটা আলোলিকার পেছনে? কী দেখে এত ভয় পাচ্ছে...? আলোলিকা কৌতূহলে ভর করে পেছনদিকে তাকাতেই দেখতে পেল, ওর পেছনদিকটা একটু আবছা অন্ধকার মতো, আর সেখানেই রয়েছে একটা কালো কাঠের দরজা। এতক্ষণ সে দরজাটা খেয়ালই করেনি। কিন্তু এ কী? দরজার বাইরে তালা ঝুলছে কেন? আর মেয়েটিই বা দরজার দিকে তাকিয়ে কী দেখে ভয় পাচ্ছে?

"কী হয়েছে, রিমি? নাও..."

আলোলিকা আবার বলল, কিন্তু মেয়েটি কিছুতেই চোখ সরাচ্ছে না পেছনের দরজা থেকে। চোখে-মুখে সেই অদ্ভুত আতঙ্ক।

"মিস রায়, ওটা আপনি রেখে দিন। এই অনাথ আশ্রমে এইভাবে একজনকে কিছু দেওয়া উচিত নয়। তাতে বাকি বাচ্চাদের মনে খারাপ প্রভাব পড়তে পারে। আপনি বরং পরে সকলের জন্য কিছু নিয়ে আসবেন।" মহিলা কথাটা আলোলিকাকে বলেই বাচ্চাদের দিকে ফিরলেন, "যাও, তোমরা ঘরে যাও।"

তার নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাচ্চারা সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকে ফের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল।

"আপনি আসুন। আপনাকে নীচের তলায় আপনার রুমটা

দেখিয়ে দিই। আপনি ফ্রেশ হয়ে নিন। বেলা একটায় বাচ্চাদের খাবার দেওয়া হয়। আপনি আজ ওদের সঙ্গেই বসে খাবেন।" কথাটা বলেই মালাদেবী সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন।

"ম্যাডাম, ওই দরজাটা বন্ধ কেন?"

আলোলিকার প্রশ্ন শুনে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়েও এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালেন মালাদেবী। তারপর বিড়বিড় করে বললেন, "এমনিই।"

* * * * * * * * *

রাত বাড়লে পাথুরে জায়গায় ঠান্ডা বাড়ে, সেটা আলোলিকা জানে, কিন্তু তা-ই বলে এত? জানালা-দরজা বন্ধ, এতগুলো বিলিতি লণ্ঠনের আগুনের আলো, আর সোয়েটার পরেও সে ঠকঠক করে কাঁপছে।

ঘড়িতে একটু আগেই দশটার ঘণ্টা পড়েছে। বাচ্চাদের খাওয়া ন-টার আগেই শেষ হয়েছে। তারা সব খাওয়াদাওয়া সেরে যে যার ঘরে চলে গিয়েছে। আলোলিকা খাওয়ার টেবিলটা পরিষ্কার করে হাত ধুয়ে গুটিশুটি মেরে মাত্র বসেছে ড্রয়িং রুমের সোফায়। চারিদিক বড়োই নিস্তব্ধ, শুধু মাঠের বয়ে-চলা হাড়-কাঁপানো ঠান্ডা বাতাস জানালার কাচের শার্সিগুলো নাড়িয়ে দিচ্ছে ঠকঠক শব্দে।

রাজেন মান্ডি খাবারটা আহামরি না বানালেও মোটামুটি চালিয়ে নেওয়া যায়। হয়তো ভালো বানাতে পারত, যদি সময় দিত। কিন্তু সূর্য ডুবলেই যা তড়িঘড়ি করে লোকটা। যেন জায়গাটা ছেড়ে পালাতে পারলেই বাঁচে।

লোকটা কথাও বলে ভীষণ কম। শুধু কি লোকটা? গাড়োয়ান থেকে শুরু করে বাচ্চাগুলো পর্যন্ত এত কম কথা বলে যে কয়েক ঘণ্টাতেই হাঁপিয়ে উঠছে আলোলিকা। আজ পর্যন্ত এতগুলো বাচ্চাকে সে কখনও দেখেনি এরকম চুপচাপ থাকতে। কে জানে এদের কী ব্যাপার। অবশ্য তার এত কিছু না ভাবলেও চলবে। মোটামুটি এই চাকরিটাকে তাকে পাকা করতেই হবে। যে করেই হোক...

শুধু বাচ্চাদের একটু দেখাশোনা করে যদি এমন আয়েশের জীবন যাপন করা যায় তাহলে সে কেন এই সুযোগ ছাড়বে?

ঠিক এমন সময় একটু হাই উঠতেই আলোলিকা ঘাড় ঘুরিয়ে ডানদিকের সরু করিডোরের দিকে তাকাল। ওই করিডোরের শেষ মাথায় তার রুমখানা। সে এখান থেকে দেখল, দরজাটা আধভেজা হয়ে আছে। নরম তুলতুলে গদিখানা আর গরম কম্বলের কথা মনে হতেই তার দু-চোখের পাতায় তন্দ্রা যেন আরও গভীরভাবে নেমে এল।

টি টেবিলের ওপর একটা লণ্ঠন জ্বলছে। সোফাতে বসেও সেই লণ্ঠনের আগুনের ওম টের পাচ্ছে আলোলিকা। আর দেরি না করে আলোলিকা উঠে দাঁড়াল। শহরে বিদ্যুৎবাতি চলে এলেও এই প্রত্যন্ত জায়গায় কবে আসবে, তার ঠিক নেই। এখানে সূর্য ডুবলে এই কেরোসিনের বাতি, আগুনের আলোই ভরসা। ঠিক আছে। নিজের মনকে প্রবোধ দিল আলোলিকা। টাকা রোজগারের জন্য এইগুলো ও নির্দ্বিধায় মানিয়ে নিতে পারবে।

পরনের শালটা গায়ে ভালো করে পেঁচিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল আলোলিকা। মালা ম্যাডাম যাওয়ার বলে গেছেন, রাত্রে ঘুমোনোর আগে সে যেন বাচ্চাদের একবার গিয়ে দেখে আসে। কিন্তু সিঁড়ির সবচেয়ে উঁচু ধাপে পা দিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। দোতলাটা আবছা অন্ধকার। বাঁদিকে বাচ্চাদের পরপর ঘরগুলো। ডানদিকে সেই তালাবন্ধ কামরাটা। কিন্তু দোতলায় উঠে ডানদিকে নজর পড়তেই এক মুহূর্তে তার মনে হল তালাবন্ধ দরজাটা হাট করে খোলা। আর ঘরের ভেতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার।

সে সঙ্গে সঙ্গে চোখ কচলে আরেকবার দেখল। নাহ্! ওই তো তালা ঝুলছে দরজার হাতলে। তাহলে? চোখের ভুল? হতেও পারে। যা ঘুম এসেছে...

বাকি দুটো ঘর দেখে আলোলিকা এগিয়ে গেল রিমির ঘরের দিকে। দরজার নীচ থেকে আগুনের আভার খানিকটা দেখা যাচ্ছে। মেয়েটা জেগে আছে তার মানে? তারপরই কী একটা শুনে চমকে উঠল আলোলিকা। এ কী? জোড়া গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না ভেতর থেকে? সকলে তো ঘুমোচ্ছে? কে আছে রিমির ঘরে?

দরজায় কান পাতল আলোলিকা।

রিমির গলা, "নাহ্... আমি তো নিইনি। তুমি তো দেখলে..."

তারপরেই কেমন একটা ঘড়ঘড়ে শব্দ। ঠিক গলায় কফ জমলে আমরা যেভাবে ঝেড়ে ফেলি।

আবার রিমির গলা, "আমার ঘুম পাচ্ছে। আজ খেলব না।"

আবার সেই ঘড়ঘড়ে আওয়াজ। কী বলছে, কিছুই বুঝতে পারছে না আলোলিকা।

"ওরা খেলুক। আমি... আমি খেলব না।"

আলোলিকা আর এক মুহূর্ত দেরি না করে দরজা ধাক্কা দিল। ঘরের মধ্যে আচমকা তাকে ঢুকতে দেখেই চমকে উঠল বাচ্চা মেয়েটা। ঘরটা ছোটো। আসবাবও খুব একটা বেশি নেই। একটা ছোটো খাট। একদিকে একটা টেবিল-চেয়ার। তার ওপর একটা লণ্ঠন জ্বলছে খুব মৃদুভাবে। আর পায়ের দিকে একটা

পাল্লা-ভাঙা আলমারি। কিন্তু এ কী? ঘরের মধ্যে তো আর কেউ নেই? রিমি কার সঙ্গে কথা বলছিল তাহলে? জিজ্ঞেস করবে মেয়েটাকে? আলোলিকা মেয়েটার গলায় স্পষ্ট ভয় টের পেয়েছে। প্রশ্ন করা কি ঠিক হবে? এখন প্রশ্ন করলে যদি আরও ভয় পেয়ে যায়? না থাক।

"এখনও জেগে আছ রিমি?"

মেয়েটা একটা ঢোঁক গিলে বলল, "ঘুম আসছে না।"

"জল খাবে?" আলোলিকার প্রশ্নে মেয়েটা মাথা নাড়াল। নাহ্। খাবে না।

"আলোটা নিভিয়ে দিই।"

"আমি অন্ধকারে ঘুমোতে পারি না।"

"আচ্ছা। ঠিক আছে। তাহলে দরজাটা খোলা থাক অল্প। ঘুমিয়ে পড়ো। কোনো দরকার পড়লে আমায় ডেকো। আমি নীচে থাকব।"

"দিদি..."

"কিছু বলবে?" ঘুরে দাঁড়াল আলোলিকা।

"তুমি না খুব ভালো।"

"তা-ই?" মেয়েটার মিষ্টি কথায় আলোলিকার মুখে হাসি ফুটল।

"হ্যাঁ, কিন্তু তুমি তো নতুন, তাই জানো না। এখানে কেউ রাতে আমরা রুমের বাইরে বের হই না। তুমিও বেরিয়ো না।"

"এরকম বলছ কেন?" কথাটা জিজ্ঞেস করতে করতে রিমির বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল আলোলিকা।

রিমি ঢোঁক গিলে খুব ফিসফিস করে বলে উঠল, "ও তাহলে তোমায় খেলতে নিয়ে নেবে..."

"ও?" আলোলিকা টের পাচ্ছে, রিমি কথা বলতে গিয়ে ভয় পাচ্ছে, "ও কে?"

"ওই যে।" আরও সরু হয়ে উঠল রিমির গলার আওয়াজ, "তোমার পেছনে যে দাঁড়িয়ে তোমায় দেখছে... ও।"

চমকে সঙ্গে সঙ্গে পেছন ঘুরল আলোলিকা। কই? কেউ নেই তো। উফ! এই মেয়েটা না। আলোলিকা বুঝল, রিমি তাকে মিছিমিছি ভয় দেখাচ্ছে।

"ঠিক আছে। বেরোব না ঘর থেকে। এবার ঘুমোও।"

আলোলিকা মুচকি হেসে ঘরের বাইরে বেরিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে যেই পিছন ঘুরেছে, অমনি দড়াম করে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। আবার চমকে উঠল আলোলিকা। ভারী অদ্ভুত তো মেয়েটা।

* * * * * * * *

রাত্রি ক-টা হবে?

বোধ করি একটা। আচমকা কাঠের মেঝেতে মচমচ শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল আলোলিকার।

ঘরটা অন্ধকার। এককোণে কোনোরকমে নিবুনিবু হয়ে জ্বলছে লণ্ঠনটা। কিছুক্ষণের মধ্যে পুরোপুরি হয়তো নিভে যাবে।

আবার সেই মচমচ শব্দ। কেউ পা টিপে টিপে কাঠের মেঝের ওপর দিয়ে হাঁটলে যেমন শব্দ হয়, এ-ও তেমনই। বিছানায় উঠে বসল সে। এমনিতেও নতুন জায়গা, নতুন বিছানা। সারাদিনের ক্লান্তি থাকলেও ঘুম আসতে খানিকটা দেরিই হচ্ছিল আলোলিকার। অনেক পরে যদিও ঘুম ধরল, কিন্তু এই মচমচ শব্দে আবার ঘুমটা ভেঙে গেল।

শব্দটা আসছে দোতলার কাঠের মেঝে থেকে। মাথার ওপরে কেউ হাঁটছে। কিন্তু কে?

ঠিক এমন সময় দুমদুম করে একটা আওয়াজ ডানদিক থেকে বামদিক বরাবর মিলিয়ে গেল। মনে হল, কেউ যেন ছুটে গেল। এত রাত্রে কে এমন ছোটাছুটি করছে?

বিছানা থেকে নেমে দাঁড়াল আলোলিকা। বাচ্চারা ঘুমোয়নি এখনও। আর এত রাত্রে ছোটাছুটিই বা করছে কেন?

গায়ে শালটা জড়িয়ে লণ্ঠনটা তুলে নিতেই এবার নীচের তলায় কারও ছোটাছুটির আওয়াজ পাওয়া গেল। আশ্চর্য! এত রাতে... এসব কী?

সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা খুলতেই একটা ঠান্ডা হাওয়া ভেতর পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিল আলোলিকাকে। দরজার বাইরেই একটা সরু করিডোর ড্রয়িং রুমে গিয়ে শেষ হয়েছে। সন্ধে থেকে ড্রয়িং রুম আর করিডোরে আলো জ্বলে। কিন্তু সেই আলো নিভে এখন জায়গাটা পুরোটাই অন্ধকার। আলোলিকার হাতের লণ্ঠনের আলো কিছুটা পড়েছে করিডোরের মধ্যে। ঠিক এমন সময় আলোলিকার মনে হল, অন্ধকার ড্রয়িং রুমে কেউ যেন ছুটে চলে গেল। অন্ধকারে ঠিক বোঝা গেল না, কিন্তু একটা অবয়ব সরে গেল যেন।

"কে? কে আছ?"

কোনো সাড়া নেই। বদলে কেউ একজন খিলখিলে হাসি হাসল অন্ধকারেই।

ভারী বিরক্ত হল আলোলিকা। ছেলেমেয়েরা এত রাত্রে এই অন্ধকারে ছোটাছুটি করছে? কোথায় একটু রাত্রিবেলা শান্তিতে ঘুমোবে তা নয়।

অন্ধকার ড্রয়িং রুমে দাঁড়াতেই বুকটা কেমন যেন ছ্যাঁত করে উঠল। এখানে দাঁড়ালে পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে বাইরে শনশন

করে বয়ে-চলা হাওয়ার শব্দ। আলোলিকা লণ্ঠনটা বাড়িয়ে ড্রয়িং রুমের চারিদিকটা ভালো করে দেখল। অন্ধকার ড্রয়িং রুমে কেউ নেই সে ছাড়া। কিন্তু সে স্পষ্ট শুনেছে কাউকে ছোটাছুটি করতে। আলোলিকা পুরো ড্রয়িং রুমটা আবার ভালো করে খুঁজল। ওরা কি আলোলিকার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে? উফ! দেখে তো মালুম হয়নি এরা এত দুষ্টু। সোফার পেছন, পর্দার আড়াল—সব খুঁজল। নাহ্‌! কোথাও কেউ নেই। তবে? তবে কি ও ভুল দেখল? এতটা ভুল?

"খিকখিক!"

আচমকা হাসির শব্দ শুনে চমকে উঠল আলোলিকা। কিন্তু ভাবনার সময় পেল না। কেউ একজন অন্ধকার সিঁড়ির উঁচু ধাপগুলো দিয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে ওপরে উঠে গেল। সে যা ভেবেছিল তা-ই। এরা রাতের আঁধারে তার সঙ্গে মজা করছে।

এক হাতে লণ্ঠন ধরে দ্রুতপায়ে ওপরে উঠতে লাগল আলোলিকা। রাতবিরেতে এসব মজা তার একদম পছন্দ নয়। এমনিতেই এসব বাচ্চার ঝামেলা তার একদম ভালো লাগে না। নেহাত পেটের দায় তাই এই চাকরি করা। ভেবেছিল, খুব দরকার না পড়লে কাউকে বকাবকি করবে না। এখন দেখছে, এসব না করলেই চলবে না। এসবই ভাবতে ভাবতে দ্রুতপায়ে ওপরে উঠছিল আলোলিকা। কিন্তু সিঁড়ির শেষ ধাপে কী একটা দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। লণ্ঠন-ধরা হাতটা সামনের দিকে মেলে ধরতেই যা দেখল, তাতে অবাক যতটা না হল, তার চেয়ে বেশি অস্বস্তি হল।

বারান্দার যেদিকটা দেওয়াল, সেখানে ছ-টা ছেলেমেয়েই পরপর দাঁড়িয়ে। শুধু দাঁড়িয়ে নয়, সবাই আলোলিকার দিকে পিঠ করে দেওয়ালে মাথা ঠুকছে। ঠুক...ঠুক...ঠুক...

খুব আসতে আসতে একটা কেঠো আওয়াজ বারান্দার ঠান্ডা হওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আলোলিকা টের পাচ্ছে, সেই আওয়াজ বেরোচ্ছে একই লয়ে, একই তালে, একই ছন্দে।

ঠুক...ঠুক...ঠুক...

"এ কী?" আলোলিকা চিৎকার করে উঠল, "তোমরা কী করছ এখানে? এত রাত্রে?"

কিন্তু মনে হল না ওরা কেউ আলোলিকার কথা শুনতে পাচ্ছে। "এই মিলি, এই রত্না... শুনতে পাচ্ছ?" আবার চিৎকার করল আলোলিকা। না, একইভাবে নিরুত্তাপ ওরা। আলোলিকা ভেবে পেল না কী করবে? এদের কি ঘুমের ঘোরে চলা অভ্যেস নাকি?

ঠিক এমন সময়ই আচমকা ওরা সকলেই একসঙ্গে থেমে গেল। তারপরই সকলে একসঙ্গে ডান হাত তুলে ডানদিকের সেই বন্ধ দরজার দিকে নির্দেশ করল সেদিকে না তাকিয়ে। সকলের আচরণ এতটাই যান্ত্রিক, এতটাই নিক্তি-মাপা নিখুঁত, দেখলে মনে হয় যেন ওরা কারও বশীভূত।

আলোলিকা ওদের নির্দেশ মেনে ধীরে ধীরে বন্ধ দরজার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু একটা জিনিস চোখে পড়তেই আচমকাই মাঝপথে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। তালাবন্ধ দরজার তালাটা একপাশে খুলে ঝুলছে, আর ঘরের দরজা আলতো ভেজানো।

কে খুলল এই বন্ধ ঘরের তালা? একটু আগেও তো এটা বন্ধ ছিল।

"এটা কে খুলেছে তোমাদের মধ্যে?" বাচ্চাদের উদ্দেশে ঘাড় ঘুরিয়ে প্রশ্নটা করতেই আরেক প্রস্থ অবাক হওয়ার পালা। কেউ নেই। হ্যাঁ, একজন বাচ্চাও সেখানে উপস্থিত নেই। এই তো ছিল সকলে? এরই মধ্যে কোথায় গেল...। একটা ভয়ংকর অস্বস্তি হচ্ছে এদের অদ্ভুত আচরণে। কী হচ্ছে তার সঙ্গে এসব?

ভাবতে পারল না বেশিক্ষণ। ভেজানো দরজাটা হাট হয়ে খুলে যাচ্ছে নিজে নিজেই। ভেতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। কী আছে, বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছে না।

ভয় পেয়ে দু-পা পিছিয়ে আসতে চাইলেও আলোলিকা কিন্তু পারল না। কে যেন পা-জোড়া টেনে কাঠের মেঝেতে গেঁথে দিয়েছে অজান্তেই। ঠিক এমন সময় অন্ধকার ঘরের ভেতর থেকে একটা কাগজের বল গড়িয়ে এসে তার পায়ে ধাক্কা মারতেই আঁতকে উঠল আলোলিকা। অন্ধকার ঘরের ভেতরে কেউ আছে। কিন্তু কে?

কোনোরকমে কাঁপা-কাঁপা হাতে কাগজটা তুলে লণ্ঠনের আলোয় মেলে ধরল আলোলিকা। আর তার মধ্যে যা দেখল, আতঙ্কের একটা শীতল শিহরন বয়ে গেল যেন মেরুদণ্ড দিয়ে।

কেউ কাগজের মধ্যে কাঁচা হাতে লিখেছে—"দেখতে পেয়ে গিয়েছি..."

কাগজের কথাটা মনে মনে যেই উচ্চারণ করল আলোলিকা, সঙ্গে সঙ্গেই কানের পেছনে কেউ একজন সাপের মতো হিসহিসে স্বরে বলে উঠল, "ধা...প্পা!"

আর তারপরেই লণ্ঠনের আলোটা নিভে গিয়ে পুরো জায়গাটা ঢেকে গেল ঘন কালো অন্ধকারে। আলোলিকার তারপর আর কিছুই মনে রইল না।

* * * * * * * *

মেন গেটের বাইরে একটা কাঠের রেলিং-ঘেরা চওড়া বারান্দা। ঠিক তার মাঝবরাবর চার-পাঁচটা ধাপের একখানা সিঁড়ি নেমে নীচের মাঠে গিয়ে মিশেছে। আজকের সকালটা রৌদ্রোজ্জ্বল। আলোলিকা দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে দেখল, বাচ্চারা এই শীতে, সকালের রোদ গায়ে মেখে খেলাধুলা করছে।

আলোলিকা একপাশের রাখা আরামকেদারায় গিয়ে বসতেই দেখা গেল, বারান্দা-লাগোয়া সামনের জমিটা কোদাল দিয়ে কোপাচ্ছে রাজেন মান্ডি। বোধহয় শাকের বীজ ছড়াবে। রাজেনকে দেখেই সকালের স্মৃতিটা আবার চোখের সামনে ভেসে উঠল আলোলিকার।

ঘুমের মধ্যেই আলোলিকা টের পায়, কেউ তাকে ধাক্কা দিচ্ছে। কিন্তু পাতাজোড়া এমনভাবে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকে যে সে কিছুতেই যেন চোখ খুলতে পারে না। বেশ কিছুক্ষণ এই ঠেলাঠেলির পর অনেক কষ্টে চোখ খুলে সে দেখতে পায়, রাজেন মান্ডির উদ্‌বিগ্ন দৃষ্টি তার মুখের ওপর ঝুলছে। প্রাথমিক বিহ্বলতা কাটতে তার কয়েক মুহূর্ত সময় লাগে। কিন্তু কয়েক মুহূর্তেই সে ধাতস্থ হয়ে ধড়ফড় করে উঠে বসে। আর ঠিক তখনই আলোলিকা আবিষ্কার করে যে সে দোতলার মেঝের ওপরেই শুয়ে রয়েছে।

"দিদি, আপনি এখানটোতে..." রাজেন মান্ডির প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না আলোলিকা, সঙ্গে সঙ্গে পূর্বরাতের স্মৃতি মনে পড়তেই মুখটা ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে যায়। একপ্রকার তড়াক করে উঠে দাঁড়াতে গিয়েই দ্যাখে সামনের দরজাটা আগের দিনের মতোই তালাবন্ধ। তাহলে কাল রাতে এই দরজাটা কে খুলেছিল।

"রাজেন, এই দরজার তালার চাবি কার কাছে আছে?"

রাজেন মাথা চুলকে বলল, "উ তো বড়োদিদিমণিটোর কাছে থাকে।"

"এখানে কারও কাছে থাকে না?"

"তা তো ঠিক জানি না। ইখানে কার কাছে থাকবে? থাকি তো আমি আর বাচ্চাগুলান...। কেন? কিছু কি হইছে?"

আলোলিকা কী একটা বলতে গিয়েও থমকে গেল। তারপর দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে সঙ্গে সঙ্গে নিজের রুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। মাথাটা ভার হয়ে আছে। আরেকটু ঘুম দেওয়া দরকার।

রাজেন একমনে মাটি কোপাচ্ছে। তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত হবে কি?

"রাজেন?"

"জি, দিদিমণি?" মাটি কোপাতে কোপাতেই জবাব দিল রাজেন।

"তুমি কতদিন এখানে কাজ করছ?"

"তা মাস সাতেক তো হবেই।"

"তার আগে কেউ কাজ করত?"

"বলতে পারব না, দিদি।"

"আমার আগে যিনি ছিলেন, তিনি কোথায় গেলেন, কিছু জানো?"

"সঠিকটো জানি না, তবে তিনি নাকি তিন দিনের মতো ছিলেন ইখানটোতে। তারপর নাকি বেদম ভয় পেয়ে চাকরি ছেড়ে পালায় গেচেন। অবশ্য তাঁকে দোষটো দিই কেমন করে। ই বিরান জায়গাটোই এমন। বাচ্চাগুলান রাতের বেলা একা থাকে কী করে কে জানে?"

"তুমি রাত্রিবেলা এখানে থাকো না কেন?"

আলোলিকার প্রশ্নে এক মুহূর্ত থমকে তাকাল রাজেন, "বাড়িতে বউ-বাচ্চা আছে তাই। তা ছাড়া..."

"তা ছাড়া..."

"মোদের গাঁয়ের লোকটো এ বাড়িটোকে ডরায়। উরা বলে এ বাড়িটো ভালো লয়।"

"কেন?" আলোলিকা অবাক, "ভয় পায় কেন?"

"জানি লাই। তবে অনেক বছর আগে কিছু একটা ঘটেছিল। থানাপুলিশ পর্যন্ত গড়াইছিল।" আলোলিকার কপালের ভাঁজ দৃঢ় হল।

"এই এলাকায় কী ঘটনা নিয়ে থানাপুলিশ হল, তুমি জানো?"

আলোলিকার প্রশ্নে রাজেন কিছুক্ষণ নিরুত্তর রইল। তারপর বিড়বিড় করতে করতে বলল, "তখন আমি সদরের সিসা কারখানায় কামটো করতাম কিনে। তাই খুব একটা পস্টো করে জানতাম না। তবে সেই ঘটনার বছরখানেক পরে আবার একটা ঘটনাটো ঘটে। যার ফলে লোকজন বাড়িটোকে ভয় পেতে শুরু করে।"

কথাটা বলে আবার কয়েক মুহূর্তের জন্য চুপ করে যায় রাজেন, তারপর আলোলিকার মুখের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলে, "পাশের গেরাম 'ধুঙ্কনি' থেকে উর্মিলি নামের একটা ছুঁড়ি নাকি কাম করতে এসেছিল এই বাড়িতে। তিন দিন পরে তাকে নাকি আর খুঁজেটো পাওয়া যায়নি পরে। বেশির ভাগ লোকজনটো বলে, মিয়াটোর নাকি চরিত্রের দোষ ছিল। সে নাকি কোন মরদের সঙ্গে পালাই গিয়েছিল কলকেতায়। তবে মিয়াটোর বাড়ির লোকজন বুলেছিল, এ বাড়িতে অভিশাপটো আছে। সেই নাকি মেয়েটিকে গিলে খাইছে।"

"তারপরেও এখানে কাজ করছ?"

"সিসা কারখানায় কাজ কইরতে কইরতে ভারী অসুখটো বাঞ্চে গো। মরণের মুখটা হন্তে ফিরেটো আসি। তারপর থিকে ভারী কাজ করতে লারে। এদিকে পেটে বিদ্যাটো লাই। ভালো কাজ কে দেবে। সংসার করছি। খেতে, পরতেটো হবেক। আর গাঁয়ে কাজ কুথা? এক বন্ধুকে ধরে এ চাকরিটো বাগাইছি। তা ছাড়া, দিনের আলোয় তো কুনো ডরটো নাই।"

আলোলিকা চুপ করে রইল। সে সকালেই বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করেছে কাল রাতের ব্যাপারে। কিন্তু কেউ কোনো সদুত্তর দিতে পারেনি। এখন রাজেনের মুখে আরেকটা গল্প শোনা গেল। এত রহস্য কেন এই বাড়ি ঘিরে? কথা বলতে বলতেই আলোলিকা মাঠের মধ্যে খেলতে-থাকা বাচ্চাদের দিকে তাকাল। আর এই ছেলেমেয়েরাই বা এত অদ্ভুত কেন? এই বয়সের ছেলেমেয়েরা হইহুল্লোড় করে, চিৎকার-চ্যাঁচামেচি করে, মারপিট করে, খিদে পেলে খাওয়ার জন্য ঘ্যানঘ্যান করে, কিন্তু এরা কিছুই করে না। ওই যে খেলছে ওরা নিজেদের মধ্যে, কারও মুখে কোনো শব্দ আছে? নেই। কী অদ্ভুত! যেন শব্দহীন পুতুল ওরা। যেন নিক্তিতে মেপে কথা বলার বাইরে ওরা কথা বলতে শেখেইনি। আর ঠিক তখনই একটা দৃশ্য ছবির মতো তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। কাল দুপুরে আলোলিকা খাওয়াদাওয়া সেরে ড্রয়িং রুমে বসে ছিল। ভাতঘুমের অভ্যাস তার কখনোই ছিল না। কিন্তু এই সুদীর্ঘ পথের ট্রেন জার্নিতে সে সত্যিই ক্লান্ত ছিল। সোফায় বসে বসেই কখন যে তার দু-চোখের পাতা লেগে গিয়েছিল, সে টেরই পায়নি। আচমকা পেছনের সিঁড়ির দিক থেকে ধপ করে আওয়াজ আর সঙ্গে সঙ্গে কাচের কিছু পড়ে ভেঙে যাওয়ার শব্দ হতেই তন্দ্রা ছিন্ন হল তার। চকিতে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনদিকে তাকাতেই চমকে উঠল সে। দেখা গেল, রত্না বলে মেয়েটা হুমড়ি খেয়ে সিঁড়ির নীচের ধাপে পড়ে রয়েছে। আর তার সামনেই একটা কাচের জগ টুকরো টুকরো হয়ে কাঠের মেঝেতে ছড়িয়ে রয়েছে। আলোলিকা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেল মেয়েটার কাছে।

"এ কী? কী হল?"

"হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছি।"

"ইশ্! কী অবস্থা হল দ্যাখো। না ঘুমিয়ে কী করছ এই দুপুরে?"

আলোলিকা ইতিমধ্যেই শুনেছে, মেয়েটা এক ধরনের যান্ত্রিক ভঙ্গিতে কথা বলে। এখনও সেই ভঙ্গির অন্যথা হয়নি। কিন্তু আজ সেই যান্ত্রিক কণ্ঠে যন্ত্রণার ছোঁয়া স্পষ্ট। আলোলিকা দেখল, কাঠের সিঁড়ির ওপর ঘষা লেগে মেয়েটির কনুইয়ের চামড়া বেশ কিছুটা ছড়ে গিয়েছে। অথচ মেয়েটি মুখে কান্নার ভঙ্গি বা যন্ত্রণার বিলাপ বিন্দুমাত্র নেই। কিন্তু যন্ত্রণা যে হচ্ছে না তা তো নয়। চোখ দিয়ে টপটপ করে পড়তে-থাকা জলের ফোঁটা সেই যন্ত্রণার চিহ্নই তো বহন করছে। অথচ মুখখানা কী অদ্ভুত নির্বিকার। এই বয়সের কারও এইভাবে হাত ছড়ে গেলে চিৎকার-চ্যাঁচামেচিতে পাড়া মাথায় করত। অথচ...

"জগে জল শেষ হয়ে গিয়েছিল। সেটাই আনতে এসেছিলাম।" মাপা উত্তর বাচ্চাটির কণ্ঠে।

"রাজেন...!" রান্নাঘরের উদ্দেশে হাঁক দিল আলোলিকা। ক্ষণিকেই হাজির হল রাজেন মান্ডি।

"এখানে ওষুধের কিছু বাক্স আছে? এই ধরো তুলো, ব্যান্ডেজ, অ্যান্টিসেপ্টিক।"

রাজেন সম্মতিসূচকভাবে মাথা নাড়াল।

"ওটা এনে দাও। আর তারপর এই জায়গাটা পরিষ্কার করে দাও। এখানে কাচের টুকরো পড়ে রয়েছে..."

কথাটা বলতেই বলতেই আচমকা রত্নার মুখের দিকে তাকাতেই থেমে গেল আলোলিকা। রত্না চোখ বড়ো বড়ো করে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে সিঁড়ির ওঠার মুখের রেলিং-এর দিকে। ঠিক রিমি যেমনভাবে ভয় পেয়েছিল দোতলার বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে, সেই এক ভয় রত্নার চোখে-মুখেও।

আচমকা আলোলিকাকে অবাক করে দিয়ে ওই অবস্থাতেও রত্না পড়ি-মরি করে ছুট লাগাল দোতলার নিজের ঘরের দিকে। যেন কিছু দেখে সে ভীষণ ভয় পেয়েছে।

"রত্না? রত্না কোথায় যাচ্ছ? ওষুধ লাগাতে হবে তো। রত্না...?" নীচ থেকে চিৎকার করে উঠেছিল আলোলিকা। কিন্তু কে কার কথা শোনে। বাঘের মুখ ফসকে হরিণ কোনোরকমে ছাড় পেলে প্রাণভয়ে যেমন দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে পালায়, রত্নার অবস্থাও যেন তা-ই। তারই কিছু মুহূর্ত পরে দোতলায় দড়াম করে দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনেছিল আলো। তখনও সে বুঝতে পারেনি এই অদ্ভুত আচরণের কারণ। এখনও যে পরিষ্কার করে সবকিছু বুঝতে পারছে তা নয়। কিন্তু সে নিশ্চিত, এই বাড়ি ঘিরে কিছু একটা জট তো আছেই। আর এই জটটাই তাকে ছাড়াতে হবে।

"তোমায় না বারণ করেছিলাম...। তারপরেও কেন রাতে বেরিয়েছিলে?"

কথাটা শুনতে পেয়েই চমকে পেছনদিকে তাকাল আলোলিকা। রিমি। কখন বাকিদের ছেড়ে যে তার পেছনে

এসে দাঁড়িয়েছে, একদম খেয়াল করেনি আলোলিকা।

"কী হল, রিমি? তুমি এখানে? ওদের সঙ্গে খেলবে না?"

"খেলব তো।" তারপর বিড়বিড় করে বলে উঠল, "একটা কথা বলতে এসেছি তোমায়।"

"আমায়?" আলোলিকা অবাক, "কী বলবে আমায়?"

রিমি গলার স্বর নামিয়ে আলোলিকার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, "ও তোমার সঙ্গে খেলতে চায়। কাল তুমি খ্যালোনি ওর সঙ্গে, ও রেগে আছে। ও খুব রাগি।"

আলোলিকা যথেষ্ট অবাক হল, কিন্তু অবাক হওয়ার ভাব লুকিয়ে মুখে হাসি এনে বলল, "তা-ই? খুব রাগি? তা কী খেলতে চায় সে?"

"লুকোচুরি। ওর পছন্দের খেলা।"

আলোলিকা টের পাচ্ছে, গত রাত্রের সেই চোরা অস্বস্তিটা আবার ফিরে আসছে ধীরে ধীরে।

"তা ও যে আমার ওপর রেগে আছে, সেটা কখন জানাল তোমায়?"

রিমি আলোলিকার পেছনে এক পলক তাকিয়ে তার কানের কাছে মুখ এনে একেবারে ফিসফিস করে বলল, "এইমাত্র। তোমার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।"

আলোলিকা আচমকা টের পাচ্ছে, এই আলোকোজ্জ্বল দিনের আলোতেও রিমির হিসহিসে স্বরটা তার সারা শরীরে কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছে একটু একটু করে।

* * * * * * * * *

আবছা অন্ধকার ঘরের বিছানায় পাথরের মতো বসে ছিল আলোলিকা। পড়ার টেবিলের ওপর রাখা জ্বলন্ত লণ্ঠনের আলো তার মুখের একাংশে এসে পড়ছে। বড়ো রহস্যময় দেখতে লাগছে আলোলিকার বরফশীতল অভিব্যক্তিহীন মুখটা।

আজ ঠান্ডার প্রকোপ অন্যদিনের তুলনায় অনেকটা বেড়েছে। ঘরের ভেতর রোজকার মতো শব্দহীন। শব্দ বলতে শুধু বাইরের খোলা প্রান্তরের শীতল হাওয়ার শোঁ শোঁ শব্দ। আলোলিকা এভাবে কতক্ষণ বসে আছে, সেসবের হিসেব একটু একটু করে যেন গুলিয়ে যাচ্ছে তার। মাথাটায় অসহ্য যন্ত্রণা। গত দু-রাত ঠিক করে ঘুম হয়নি। পরশু রাতের মতোই অদ্ভুত সব ঘটনার পুনরাবৃত্তি কাল রাতেও হয়েছে।

ঘুমটা ধরে আসার পরেই ঠিক মাথার ওপর দোতলায় কারও পদচারণা শুনে একইভাবে ঘুম ভেঙে যায় তার। তবে কালকে নতুন সংযুক্তি ছিল একটা অদ্ভুত খিলখিলে হাসি। সে হাসি আচমকা শুনলে বুকের রক্ত আপনা থেকেই যেন জল হয়ে যায়। বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে ছিল সে। কিছুতেই, কিছুতেই এই ডাক শুনবে না এই ব্যাপারে বদ্ধপরিকর ছিল সে। ক্ষণিক পরেই টের পেয়েছিল, দোতলার পদচারণা আচমকা হাজির হয়েছে তার দরজার বাইরের করিডোরে। চুপটি করে মড়ার মতো পড়ে ছিল আলোলিকা। ঘুমের ভান করে। কিন্তু অকস্মাৎ তার সমস্ত অনুভূতি যেন ভোঁতা হয়ে যায় একটা সুতীক্ষ্ণ চিৎকারে। ধড়ফড় করে নিজের বিছানায় উঠে বসে সে। কে চিৎকার করছে বাইরে? রিমির গলা বলে মনে হচ্ছে না? কী হল ওর? চিৎকার করছে কেন এইভাবে? দেরি না করে পড়ি-মরি করে কোনোরকমে আলো নিয়ে দৌড়ে যায় ড্রয়িং রুমের দিকে।

সে নিশ্চিত ছিল, আওয়াজটা ড্রয়িং রুমের দিক থেকেই আসছিল। কিন্তু সেখানে পৌঁছে কাউকেই দেখতে পায় না সে। ঠিক এমন সময় সিঁড়ি দিয়ে কী একটা গড়াতে গড়াতে তার পায়ের কাছে এসে থেমে যেতেই শিউরে ওঠে আলোলিকা। আগের দিনের মতোই একটা কাগজের বল। সারা শরীর এক শীতল আতঙ্কে কেঁপে ওঠে, যখন দ্যাখে, কাগজের মধ্যে লেখা আছে একটাই কথা—"আমায় খোঁজো।"

সেটা দেখেই চিৎকার করে ওঠে আলোলিকা, "নাহ্! আমি খুঁজব না। শুনতে পেলে তুমি? আমি তোমায় খুঁজব না। আমি খেলতে চাই না তোমার সঙ্গে। কে আছো, সামনে আসো। কী হল? এসো বলছি।" পুরো কথাটা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই মাথার ওপর একটা বিশ্রী খিলখিলে হাসি। সঙ্গে সঙ্গে লণ্ঠন-ধরা হাতটা ওপরদিকে উঁচিয়ে ধরতেই যা দেখল, তাতে সারা শরীরের রোমকূপ আপনা থেকেই খাড়া হয়ে গেল।

দোতলার বারান্দার রেলিং ধরে কেউ একটা মুখ বাড়িয়ে তাকে দেখছে। কিন্তু সে মুখে নাক নেই, কান নেই, দাঁত নেই, ঠোঁট নেই। রয়েছে কেবল একজোড়া চোখ। সেটাও এত দূর থেকে বাইরে ঠিকরে বেরিয়ে-আসা একজোড়া সাদা মাংসপিণ্ড বই আর কিছুই লাগছে না। সেই চোখের দিকে তাকিয়ে আলোলিকার মনে হল, মাথার ভেতরটা যেন ধীরে ধীরে সাদা হয়ে যাচ্ছে। কেউ ভেতরকার সমস্ত বোধ, চেতনা, অনুভূতিকে যেন শুষে খাচ্ছে।

ঠিক এমন সময়ই কে যেন কানের পেছনে খুব শীতল স্বরে বলে উঠেছিল, "ধা...প্পা!"

ব্যাস, তারপর আর কিছুই মনে নেই। সকালে একইভাবে ঘুম ভেঙেছিল রাজেনের ডাকে, সেই একই মাথা ভার অবস্থায়।

"দিদিমণি, আপনার কি ঘুমের ঘোরে চলার রোগটো আছে? কাল দোতলার বারান্দায়, আজ এই বসার ঘরেটোর মেঝায়..." উত্তর দিতে পারেনি আলো। নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে নিয়েছিল সে।

বিছানায় বসে বসে এইসবই আকাশ-পাতাল ভাবছিল আলোলিকা। এমন সময় রাত্রির নিস্তব্ধতাকে নস্যাৎ করে বারোটার ঘণ্টার ধ্বনি পুরো ঘরে ছড়িয়ে পড়তেই আলোলিকার ভাবনা ছিন্ন হল। তারপর কী একটা মনে পড়তেই বালিশের তলা হাতড়ে বের করে আনল দুটো খবরের কাগজের কাটিং। দুটোতেই যে ছবি আছে তা ঝাপসা হলেও ছবির পাশে বড়ো বড়ো হেডলাইনের লেখা পরিষ্কার—"অনাথ আশ্রমে নৃশংসতা, অভিযুক্ত আশ্রমের মালকিন ও তার কন্যা"। খবরের ভেতরের অংশে যে তথ্য দেওয়া আছে, তার সারাংশ খানিকটা এরকম—পুরুলিয়ার হুরা এলাকায় একটি অনাথ আশ্রমে দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় অনাথ বাচ্চাদের প্রতিপালনের নামে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা হচ্ছিল। শুধু তা-ই নয়, আবাসিকদের ওপর নৃশংসতা চালাচ্ছিলেন অনাথ আশ্রমের মালকিন ওই খ্রিস্টান মহিলা। খাবার না-দেওয়া, মানসিক নির্যাতন করা থেকে শুরু করে শারীরিক নিগ্রহ পর্যন্ত। এখানেই ব্যাপারটা থেমে নেই, মহিলাটির একটি বিকৃত মানসিকতার কন্যাও এই নিগ্রহে সমান পারদর্শী। নিপীড়িতদের বয়ানে সেই মেয়েটি নাকি সবসময় আবাসিকদের তার সঙ্গে লুকোচুরি খেলার জন্য উত্যক্ত করত। আর তাতে তারা নিমরাজি হলেই মায়ের সাহায্যে চলত উৎপীড়ন। পুলিশ অনাথ আশ্রমটি সিল করে, মহিলাটিকে আর তার মেয়েটির ওপর মামলা দায়ের করে পুলিশি হেপাজতে নিয়েছে।

দ্বিতীয় কাটিং-এ লেখাটা আরও মারাত্মক। সিল হয়ে-যাওয়া অনাথ আশ্রমটির বিকৃতমনস্ক মেয়ের অস্বাভাবিক মৃত্যু। প্রসঙ্গত, যথোপযুক্ত প্রমাণের অভাবে অনাথ আশ্রমকাণ্ডে মাসকয়েক আগেই মা-মেয়ে বেকসুর খালাস।

এই দুটো পেপার কাটিংই আলোলিকা খুঁজে পেয়েছে মালাদেবীর কেবিনে, অনেক খোঁজাখুঁজির পর। গতকাল রাত্রের ঘটনার পর সে সকালেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, আর নয়। এই রহস্যের সমাধান হয় সে করবে, নতুবা এই চাকরি ছেড়ে দেবে। সকালে সব বাচ্চাকে আবার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সব জিজ্ঞাসা করেছিল আলোলিকা। কিন্তু তারা আগের মতোই নিরুত্তর থেকেছে এই ব্যাপারে। বাধ্য হয়ে মালাদেবীর কেবিনে ঢুকেছিল আলোলিকা।

রহস্যের সমাধানের জন্য কোথাও না কোথাও থেকে তাকে শুরু করতেই হত, কিন্তু এই কেবিনে ঢুকে অনেক খোঁজাখুঁজির পর পুরোনো ফাইলের ভেতর থেকে যে দুটো তথ্য সে হাতে পেল, তাতে তার ভুরুর ভাঁজ আরও আরও গভীর হল। সে বুঝতে পারল, পেপারের কাটিং-এ যে অনাথ আশ্রমের কথা বলা হয়েছে, সেই অনাথ আশ্রমেই আলোলিকা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু মালাদেবী যা বলেছিলেন, তার সঙ্গে আসল ঘটনার এত পার্থক্য কেন? মালাদেবীর সঙ্গে কথা বলা দরকার। সে যখন পেপার কাটিং দুটো নিয়ে মালাদেবীর কেবিনে দাঁড়িয়ে এসব ভাবছিল ঠিক সেই মুহূর্তে অফিসের দরজায় একজনের উপস্থিতি টের পেয়ে চমকে ওঠে আলোলিকা।

অফিসের দরজায় মালাদেবী স্বয়ং দাঁড়িয়ে। সে ভুলে গিয়েছিল আজ রবিবার। মালাদেবীর আশ্রমে আসার দিন। অবশ্য তাতে লাভে বরই হল আলোলিকার।

"আপনি এই কেবিনে কী করছিলেন? আপনি জানেন না, এই কেবিনে অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ নিষেধ?" মালাদেবী বরফশীতল দৃষ্টিতে তাকালেন আলোলিকার দিকে। আগের বারে এই ধরনের স্বরে তাঁকে কথা বলতে শোনেনি আলো। একটু যে ভয় পায়নি সে তা নয়, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে যতটা সম্ভব স্থির গলায় বলে উঠল, "কিছু প্রশ্নের উত্তর খুঁজছিলাম।"

"প্রশ্ন?" ভ্রূ কুঁচকে উঠল মালাদেবীর, "কী প্রশ্ন?"

দেরি না করে সে আসার দিন রাতে বেলা থেকে শুরু করে কাল রাত্রি পর্যন্ত যা যা হয়েছিল তা সবিস্তারে বর্ণনা করে মালাদেবীর কাছে। তারপর পেপার কাটিং দুটো তার মুখের সামনে টেবিলের ওপর রেখে কৈফিয়ত নেওয়ার সুরে বলে ওঠে, "কোনটা সত্যি আর কোনটা গল্প, ম্যাডাম? যেটা আপনি বলেছিলেন নাকি যেটা এখানে লেখা আছে?"

আলোলিকার প্রশ্নে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন মালাদেবী। যেন পাথর হয়ে গিয়েছেন। তারপর অবসন্ন শরীরটা চেয়ারের ওপর এলিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, "আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি, মিস রায়। আমি প্রথম দিন আপনাকে সত্যিটা বলিনি। কারণ আমার মনে হয়েছিল, নেপথ্যের ঘটনাটা জানলে আপনি ভয় পেয়ে যাবেন। পেপারের কাটিং-এ যে কথাগুলো লেখা আছে, সেটা সত্যি হলেও পুরোপুরি সত্যি নয়।"

"তাহলে পুরো সত্যিটা কী?" আলোলিকা খরস্বরে প্রশ্নটা করতেই, মহিলা টেবিলের ওপরে রাখা জল ভরতি কাচের গেলাস টেনে তাতে একটা চুমুক দিলেন। তারপর ধীরে ধীরে

বলতে শুরু করলেন, "মহিলা খ্রিস্টান ছিলেন। আপনার নিজেরও হয়তো অভিজ্ঞতা রয়েছে, পুরুষরা কখনোই নারীদের হাতে ক্ষমতা দেখতে পছন্দ করে না। এক্ষেত্রেও সেই বিষয়ের অন্যথা হয়নি। একজন একাকী মহিলা, তায় বিধবা একটা বিরাট বড়ো সম্পত্তি আগলাচ্ছেন। শুধু তা-ই নয়, নিজের বাড়িকে অনাথ আশ্রম গড়ে সেইসব বাচ্চাকে আশ্রয় দিচ্ছে, যাদেরকে এলাকার মাথারা অপয়া আর বিপজ্জনক বলে দাগিয়ে দিয়েছিল। এ তো পুরুষতন্ত্রের অবমাননা। সমাজের সিংহাসনে বসে-থাকা সমাজপতিরা একজন নারীর এই ঔদ্ধত্য মেনে নেবেই বা কেন?

"তাদেরই নির্দেশে গুটিকয়েক লোক এইসব অঞ্চলে প্রচার করতে লাগল যে মহিলা বাচ্চাদের আশ্রয় দেওয়ার নাম করে ধর্মান্তরিত করছেন। আপনি খুব ভালো করেই জানেন, ধর্মের নামে লোকজন চিরকাল স্পর্শকাতর। ধর্মের নাম নিয়ে নরহত্যা করা যায়, ধর্মরক্ষার অজুহাতে দেশ দখল করা যায়। ধর্ম হল পৃথিবীর সবচেয়ে মুখরোচক অথচ বিষাক্ত খাবার। স্বভাবতই এইসব গুজবে পার্শ্ববর্তী এলাকায় লোকেদের মধ্যে ভেতরে ভেতরে অসন্তোষ দানা বাঁধতে শুরু করে। তারই ফল ছিল মহিলার বিরুদ্ধে আনা মিথ্যে অভিযোগটা। অভিযোগে এই বলা হয়, মহিলা আর তার মেয়ে নাকি আবাসিকদের ওপরে মানসিক নির্যাতন চালাতেন। খেতে দিতেন না, মারতেন। ইত্যাদি ইত্যাদি।"

"অভিযোগটা মিথ্যে ছিল?"

"মিথ্যে না হলে মহিলা কয়েকদিনের মধ্যে আদালত হতে বেকসুর খালাস হলেন কী করে?"

"আর দ্বিতীয় পেপার কাটিং-এ যা লেখা আছে...?"

কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে জানালার বাইরের দিগন্তবিস্তৃত মাঠের দিকে তাকালেন মালাদেবী, "মেয়েটি রোগে ভুগে সত্যি সত্যিই মারা যায়। দোতলার যে তালাবন্ধ ঘরটি দেখেছেন, ওটা ওই মেয়েটিরই ঘর। মেয়েটি মারা যাওয়ার পর আশ্রমের মালকিন ঘরটা তালাবন্ধ করে রাখেন।"

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল আলোলিকা। কী যেন ভাবল, তারপর বিড়বিড় করে বলে উঠল, "আমার সঙ্গে গত দু-দিন যা হয়েছে..." কথাটা বলেই আলোলিকা আবার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে শুরু করে গত দুই রাতের ভৌতিক বর্ণন।

পুরোটা শোনার পরেই মহিলার ঠোঁটের কোলে এক ব্যঙ্গাত্মক হাসি খেলে যায়।

"আপনি হাসছেন?" আলোলিকা অবাক চোখে মালাদেবীর দিকে তাকাতেই মালাদেবী চোখ তুলে তাকালেন—"আপনাকে বুদ্ধিমান ভেবেছিলাম, মিস রায়, কিন্তু এখন সেই ধারণা বদলাতে হচ্ছে।"

"মানে?"

"মানে আপনি ধরতেই পারেননি যে সবটাই বাচ্চারা করেছে।"

"বাচ্চারা?"

"হ্যাঁ, গত বছর ইন্সপেকশনের সময় যিনি এসেছিলেন, তিনি ভয় পেয়েই এখান থেকে চলে গিয়েছিলেন। পরে আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, এসবের পেছনে বাচ্চারাই ছিল। ওঁকে ভয় দেখিয়ে বাচ্চারাই তাড়িয়েছিল। আপনার ক্ষেত্রেও তা-ই হচ্ছে।"

"কিন্তু বাচ্চারা এসব কেন করবে? মানে ওদের কী লাভ?" আলোলিকা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না যে এগুলো সব বাচ্চাদের কাজ।

"একটা কথা বলুন তো, যেখানে ওদের কেউ শাসন করার নেই, কারও নজরদারিতে থাকতে হয় না, সেখানে হঠাৎ করে কেউ এসে নজরদারি আর শাসন শুরু করলে ওদের কি এসব পছন্দ হবে? যেখানে বাচ্চারা নিজেরাই নিজের মর্জির মালিক, সেখানে হঠাৎ করে হাজির হয়ে ওদের ওপর নজরদারি শুরু করলে ওরা সেটা কেন মেনে নেবে? বরং বিরোধিতাই তো করবে। যাদেরকে আপনি নিষ্পাপ শিশু ভাবছেন, বলতে দ্বিধা নেই, তারা কিন্তু এক-একটা বিচ্ছু। এবার একটু ভেবে বলুন তো... এখনও পর্যন্ত যা দেখেছেন বা শুনেছেন, তার বেশির ভাগটাই বাচ্চাদের আচরণ দ্বারা প্রভাবিত কি না?"

কথাটা শোনার পরই আলোলিকার মাথায় এল, সত্যি তো! গত দু-দিনে যা যা হয়েছে, সবই রিমির কথা শুনেই। সে বারবার একজন ভ্রান্ত কারও অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে, যাকে কখনোই চোখে দেখেনি আলোলিকা। শুধু কাল রাতে সে দোতলার রেলিং বরাবর অদ্ভুত একটা জীবকে ঝুলতে দেখেছিল। আচ্ছা, সেটাও তো বাচ্চাদের তৈরি কোনো চাতুরী হতে পারে? মহিলার কথা যদি সত্যি বলে ধরে নেওয়া হয় তাহলে যারা তাকে প্ল্যানমাফিক এইভাবে ভয় দেখাতে পারে, তারা সবকিছুই করতে পারে। কিন্তু তারপরেও তো কিছু প্রশ্ন...। ঠোঁট কামড়ে কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবল আলোলিকা।

"আপনি বলেছিলেন, দোতলার দরজাটা সবসময় বন্ধ থাকে, সেটা পরশু রাত্রে আমি খোলা দেখেছি। শুধু খোলা ছিল না, কেউ ছিলও ওই ঘরে।"

"এই আশ্রমের সবচেয়ে বড়ো আবাসিক হওয়ার জন্য

মিলির কাছে এই বাড়ির সব ক-টি দরজার ডুপ্লিকেট চাবি রয়েছে। অতএব বুঝতেই পারছেন...।" কথাটা শেষ করে শরীরটাকে চেয়ারে এলিয়ে দিলেন মালাদেবী।

"এরপরে আমি আর আপনাকে জোর করব না। আপনি রিজাইন দিতে চাইলে এখনই দিতে পারেন। কেউ আপনাকে আটকাবে না।"

বাচ্চাগুলো এত বিচ্ছু তা আলোলিকার জানাই ছিল না। বিশেষ করে ওই রিমি বলে মেয়েটা। বাকিরা বড়ো, ওরা বদমাশি করতেই পারে, তা-ই বলে অতটুকু পুঁচকে মেয়েটাও? ওকে বড়ো নিষ্পাপ মনে করেছিল আলো। অবশ্য বাচ্চারা তো সেটাই শেখে, যা বড়োদের করতে দ্যাখে। রিমিরই আর দোষ কী?

নাহ্, আলোলিকা রিজাইন দেয়নি। এই ন্যূনতম কারণের জন্য এই চাকরি থেকে রিজাইন দেওয়ার মানে হয় না। পুরো ঘটনায় প্রাথমিকভাবে মানসিক ধাক্কা পেলেও এখন সে নিজেকে সামলে নিয়েছে। কাল থেকেই এই বদমাশ বাচ্চারা তার অন্য রূপ দেখতে পাবে। বাচ্চা তার পছন্দের কখনোই নয়, কিন্তু তারপরেও ভেবেছিল, বাচ্চাদের সঙ্গে ও রূঢ় আচরণ করবে না, কিন্তু এখন এ ছাড়া তো আর উপায় দেখছে না সে।

আলোলিকা বালিশের তলায় পেপার কাটিং দুটো চালান করে লণ্ঠনের আলোটা কমিয়ে দিল। তারপর কম্বলের ভেতরে শরীরটা ঢুকিয়ে দিতেই একটা অপার্থিব শান্তি ছড়িয়ে পড়ল পুরো শরীর জুড়ে। ওহ্ কী আরাম! শরীরটা তার ক্লান্ত ভীষণ। গত দু-রাত্রি তার ঘুম হয়নি ঠিক করে। আজ সে একটু শান্তিতে ঘুমোবে। বাচ্চাদেরকে সে বুঝতে দেয়নি যে ওদের জারিজুরি আলোলিকা ধরতে পেরে গিয়েছে। রিমি আজকেও খাওয়ার পর কানের কাছে ফিসফিস করে বলেছে, "আজকে কিন্তু ভুলেও বেরোবে না ঘর থেকে। কেমন?"

এসব ভাবতে ভাবতে প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিল আলোলিকা। ঠিক এমন সময় আচমকা তার খেয়াল হল, কোথাও একটা খুব মিষ্টি কিছু আওয়াজ হচ্ছে। কারও পায়ে হাঁটা বা খিলখিলে হাসির মতো বেখাপ্পা নয়, বরং একটা রিনরিনে সুর যেন বেজে চলছে আচমকা।

"কীসের আওয়াজ এটা?" ঘুমের মধ্যেই টের পাচ্ছে, আওয়াজটা তার সারা শরীর জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে যেন। সে এর আগেও কোথাও যেন শুনেছে এই আওয়াজটা, কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছে না কোথায় শুনেছে।

কয়েক মুহূর্তমাত্র তারপরেই বিদ্যুৎ ঝিলিকের মতো আলোলিকার মাথার ভেতরে ধাক্কা মারল একটা দৃশ্য। মালাদেবী দোতলার ঘন্টাটা বাজিয়ে বলছেন, "রাতের বেলা কোনো দরকার পড়লে অনেক সময় ওরা এই ঘন্টিটা বাজায়। খেয়াল রাখবেন।"

ধ্যাত্তেরিকা! বিরক্ত হয়ে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল আলোলিকা। বাজাক গে যাক। এখন আর কী দরকার পড়বে এমন? এরা যা এক-একটা পিস, তাতে ছোটোখাটো দরকার এরা নিজেরাই সামলে নেবে।

কিন্তু ঘন্টার আওয়াজটা একনাগাড়ে বেজেই চলল। থামবার কোনো লক্ষণই টের পাওয়া গেল না।

আর বিছানায় শুয়ে থাকতে পারল না আলোলিকা। আচ্ছা, কারও কোনো শরীর খারাপ হল না তো? না হলে ঘন্টা বাজাবে কেন? সর্বনাশ! সে হলে তো মুশকিল।

নাইটির ওপর শালটা জড়িয়ে বিছানা থেকে নেমে এল আলোলিকা। উফ! গরম কম্বল থেকে বেরোনোমাত্র আবার ঠান্ডাটা যেন প্রবল বিক্রমে জড়িয়ে ধরল তাকে।

ঘরের দরজাটা খুলেই দেখল, ড্রয়িং রুমটা অন্ধকার হলেও করিডোরের লণ্ঠনগুলো জ্বলছে। আলোলিকা অশান্তির ভাবখানা মুখে যেন চেপে রাখতে পারল না। যদি সত্যি কোনো জরুরি কারণ না হয়ে এটা শুধুমাত্র মজা হয়, তাহলে সত্যি সত্যি এই ধরনের দুষ্টুমির শাস্তি ও দেবে ওদের।

ড্রয়িংরুমে এসে দাঁড়াতেই ঘন্টার আওয়াজটা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

"আসছি।" নীচের থেকেই সাড়া দিল আলোলিকা। নাহ্! তারপরেও ঘন্টা থামল না।

ড্রয়িং রুমটা অন্ধকার হলেও দোতলার বারান্দায় লণ্ঠনের আলো টের পাওয়া যাচ্ছে।

"কী হয়েছেটা কী?" বিরক্তিটা কোনোভাবেই আর লুকোতে পারছে না আলোলিকা। পায়ে দুমদাম শব্দ করেই সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে লাগল। কিন্তু সিঁড়ির উঁচু ধাপে উঠেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। লণ্ঠনের আলোর ঈষৎ হলদেটে আভা দেওয়ালে টাঙানো ঘন্টার ওপরে পড়ছে, আর তাতেই দেখা যাচ্ছে ঘন্টাখানার নীচে কেউই নেই। হ্যাঁ, ঠিকই পড়ছেন। কেউ ছিল না সেখানে। ঘন্টাটা নিজে নিজেই টুংটাং শব্দে বাজছিল।

বিস্ময়ে চোখজোড়া বড়ো বড়ো হয়ে গেল আলোলিকার। এ কী করে সম্ভব? ঘন্টাটা নিজে নিজেই বাজছে কী করে?

ঠিক সেই মুহূর্তেই তার চোখ পড়ল কাঠের মেঝের ওপর পড়ে-থাকা এক টুকরো সাদা কাগজের ওপরে। বিহ্বল আলোলিকা কাগজটা তুলে জ্বলতে-থাকা লণ্ঠনের কাছে সরে এসে যেই খুলে দেখল কাগজটা, নিমেষে ওর বিহ্বল ভাব

উধাও হয়ে গিয়ে মাথায় ধক করে যেন আগুন জ্বলে উঠল।

কাগজে সেই একই হাতের লেখায় কেউ লিখে রেখেছে—"টুকি!"

"রাতবিরেতে ইয়ারকি হচ্ছে..."

আর সহ্য করতে না পেরে চিৎকার করে উঠল আলোলিকা। সে ভেবেছিল, কোনো দরকারে হয়তো কেউ তাকে ডাকছে। কিন্তু এখন বুঝতে পারছে, সবটাই তাকে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্য ছাড়া আর কিছুই না।

"কী ভেবেছ? আমি কিছু বুঝতে পারিনি...? সব আমাকে এখান থেকে তাড়ানোর জন্য তা-ই না? কিন্তু কান খুলে সবাই শুনে রাখো, আমি এখান থেকে যাব না। বুঝেছ তোমরা, আমি এখান থেকে যাব না। দেখি, এরপরও আমার সঙ্গে কত রসিকতা করতে পারো তোমরা..."

বাচ্চাদের ঘরের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে কথাটা বলে উঠল আলোলিকা, "শুনতে পাচ্ছ তোমরা?", গলার মাত্রাটা আরও উঁচুতে তুলল আলোলিকা। বিরাট বড়ো বাড়ির নিশ্চুপ প্রকৃতিতে কথাগুলো গমগম করে উঠল।

"এরপর আর যদি কোনো রকমের অসভ্যতা দেখি..."

ক্যাঁ...চ!

কথাটা শেষ হল না, তার আগেই সেই পেছনদিকের বন্ধ দরজা থেকে একটা বিশ্রী কেঠো শব্দ বেরিয়ে আসতেই চমকে পেছনদিকে ঘুরে তাকাল আলোলিকা। সেই বন্ধ দরজাটা খুব আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে আপনা থেকেই। আলোলিকা দেখল খোলা দরজার ভেতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। বারান্দার লণ্ঠনের মৃদু আলো দরজার মুখের কিছুটা অংশ আলোকিত করে দম হারিয়েছে যেন।

দরজাটা পুরোপুরি খুলে যেতেই কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। শব্দ বলতে বাইরে বয়ে-চলা শনশন হাওয়ার শব্দ। আলোলিকা প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে খোলা দরজার ভেতরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। দু-চোখ অন্ধকারের ভেতরে প্রবলভাবে কারও অস্তিত্ব খোঁজার চেষ্টা করছে। কিন্তু কই? কিছু তো টের পাচ্ছে না সে। কয়েক মুহূর্ত সময় এইভাবে কেটে যাওয়ার পর আচমকা অন্ধকার ঘরের ভেতর থেকে আবার একটা কাগজের বল গড়িয়ে এল আলোলিকার পায়ের আছে। আর তারপরেই অন্ধকার ঘরের ভেতর থেকে খিলখিলে হাসি। আলোলিকা কাগজটা খুলে দেখল, তাতে লেখা আছে—"লুকোবে না?"

অজান্তেই চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল আলোলিকার। আজ একটা হেস্তনেস্ত করেই ছাড়বে সে। দেওয়ালের হুক থেকে লণ্ঠনটা নামিয়ে দ্রুতপায়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল আলোলিকা। আর ঘরের মধ্যে ঢুকতেই একটা বিশ্রী সোঁদা গন্ধ তার নাকে ধাক্কা মারল।

এই ঘরটা খুব বড়ো নয়, কিন্তু আসবাবপত্রে ঠাসা। ধুলো থেকে বাঁচানোর জন্য বড়ো বড়ো সাদা চাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে আসবাবগুলি। একদম উপযুক্ত একটা পরিবেশ লুকোচুরি খেলার জন্য।

"কে আছ ভেতরে? রিমি? নাকি মিলি? নাকি শ্যামা? নাকি ছেলেরা?"

কোনো উত্তর এল না, তার বদলে কেউ একজন খিলখিল করে হাসতে হাসতে অন্ধকারে দৌড়ে চলে গেল একদিক থেকে আরেক দিকে।

"আমি ধরতে পারলে কিন্তু খুব খারাপ হয়ে যাবে..." চিৎকার করে উঠল আলোলিকা, রাগে তার মাথা জ্বলছে।

আবার খিলখিলে হাসি। যেন ভারী মজা পেয়েছে ওরা।

আলোলিকা দেরি না করে এক হাতে লণ্ঠন ধরে অন্য হাত দিয়ে জিনিসপত্রগুলো থেকে সাদা চাদর টেনে সরাতে লাগল। নিশ্চয়ই এগুলোর আড়ালেই লুকিয়ে রয়েছে। কালকের সকালের খাবার যদি না বন্ধ করে রেখেছি, তো আমার নামও আলোলিকা নয়। মনে মনে গজগজ করে উঠল সে। ঠিক এমন সময় টেবিলের নীচে কেউ লুকিয়ে আছে কি না, সেটা দেখার জন্য টেবিলের ওপরের আস্তরণ যেই টেনে সরিয়েছে, অমনি লণ্ঠনের আলো পড়ে টেবিলের ওপর রাখা একটা জিনিসে চোখ আটকে গেল আলোলিকার।

একটা ফোটো ফ্রেম।

ফোটো ফ্রেমের ছবিতে একজন মহিলা আর মহিলার কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি বাচ্চা মেয়ে। দুজনেই নিষ্পলক দৃষ্টিতে যেন তাকিয়ে রয়েছে আলোলিকার মুখের দিকে। ফোটো ফ্রেমটা হাতে নিয়ে আলোলিকার যেন সব গুলিয়ে যেতে লাগল একটু একটু করে।

বাচ্চা মেয়েটিকে সে আগেই দেখেছে। পেপারের যে কাটিং-এ অনাথ আশ্রমের মালকিনের মেয়েটির মারা যাওয়ার খবর বেরিয়েছিল, সেখানে এই মেয়েটির ছবিই সে দেখেছে। তার মানে এ মালকিনেরই মেয়ে। কিন্তু এই মেয়েটির সঙ্গে এই মহিলা কী করছেন?

ঠিক তখনই ফোটো ফ্রেমের নীচের দিকে একটা লেখা দেখতে পেয়ে আপাদমস্তক কেঁপে উঠল আলোলিকা।

"Mina Santra Gomes with her beloved mother Mala Santra Gomes"

মালা সাঁতরা... গোমস! তার মানে?

"এই মেয়েটির মা মালাদেবী? তার মানে মালাদেবীই এই আশ্রমের সেই মালকিন?"

"হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ।"

আচমকা দরজার কাছ থেকে সেই অতি পরিচিত অদ্ভুত স্বরটা শুনে চমকে উঠল আলোলিকা। সঙ্গে সঙ্গে পেছন ঘুরতেই লণ্ঠনের আবছা আলোয় দেখা গেল, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন মালা সাঁতরা ওরফে মালা সাঁতরা গোমস। এই অনাথ আশ্রমের মালকিন। কিন্তু এই মুহূর্তে মহিলার চোখ-মুখ কেমন একটা অন্যরকম লাগছে। ঠিক যেন মৃত মানুষের মতো, ফ্যাকাশে আর নিষ্প্রাণ।

এই সময়, এখানে তাঁকে দেখে যতটা না অবাক হল আলোলিকা, তার চেয়েও অসহায় বোধ করল এই জটিল পরিস্থিতির মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করে।

"আপনি আমায় মিথ্যে বলেছিলেন?" লণ্ঠনটা মেঝেতে নামিয়ে আলোলিকা পা-পা করে এগিয়ে এল মালা সাঁতরার দিকে। কিন্তু মালা সাঁতরা নির্বিকার।

"চুপ করে থাকবেন না, বলুন, আপনি আমায় মিথ্যে বলেছিলেন?"

"হ্যাঁ। বলেছি।"

"কিন্তু কেন? কীসের জন্য এতগুলো মিথ্যা বলেছিলেন আমায়?" প্রবল উত্তেজনায় আলোলিকার সারা শরীর কাঁপছে।

"মিথ্যে না বললে তুমি এখানে থাকতে না। আর তুমি না থাকলে..."

"না থাকলে?" আলোলিকা মেঝেতে লণ্ঠনটা রেখে অবাক গলায় তাকাল মহিলার শীতল মুখের দিকে, "না থাকলে কী বলুন? চুপ করে গেলেন কেন? বলুন, না থাকলে কী?"

"না থাকলে, আমার মেয়ে খেলবে কার সঙ্গে?"

কথাটা শুনেই প্রচণ্ড রাগে আলোলিকার মাথায় যেন আগুন ধরিয়ে দিল কেউ। সঙ্গে সঙ্গে মহিলাটির গলা দু-হাতে শক্ত করে টিপে ধরল সে।

"শয়তান বুড়ি, ঠগ, জোচ্চুরি করার জায়গা পাওনি?" প্রবল রাগে দাঁতে দাঁত চেপে চিৎকার করে উঠল আলোলিকা। আর সেই সঙ্গে বাড়তে লাগল তার আঙুলের চাপ। "আমায় চেনো না তুমি, তোমায় আমি শেষ করে দেব। শেষ করে দেব...।" কথাটা শেষ করতে পারল না আলোলিকা, তার আগেই মালা গোমস হাতের আড়ালে লুকিয়ে-রাখা একটা পাথরের মূর্তি সজোরে বসিয়ে দিল আলোলিকার মাথায়। এক মুহূর্ত সময় ব্যয় হল না, সঙ্গে সঙ্গে চোখে অন্ধকার দেখে মেঝের ওপরে লুটিয়ে পড়ল আলোলিকা। শুধু জ্ঞান হারানোর আগের মুহূর্তে আলো টের পেল, মালা সাঁতরার নিষ্প্রাণ মুখটা ধীরে ধীরে ঝুঁকে পড়ছে তার মুখের ওপরে।

* * * * * * * * *

"ধা...প্পা...!"

চারিদিকে প্রবল অন্ধকার, আর মাথার ডানদিকে অসহ্য টনটনে ব্যথা নিয়েই আলোলিকা চোখ খুলল। অন্ধকারে প্রথমে কিছু ঠাওর হয় না। কিন্তু তারপরেই কী একটা মনে পড়তেই ধড়ফড় করে উঠে বসতে গেল আলোলিকা। সঙ্গে সঙ্গে মাথার ডানদিকটা যন্ত্রণায় ঝনঝন করে উঠল।

"আহ্!" যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল আলোলিকা। কোনোরকমে খাটের পায়ায় পিঠটা ঠেস দিয়ে সোজা হয়ে বসতেই সে দেখতে পেল, লণ্ঠনটা একটা চেয়ারের ওপরে ইতিমধ্যেই তুলে রাখা হয়েছে। তারই কিছুটা আলো ঘরের দূরের কোণগুলোতে অদ্ভুত ভূতুড়ে আবহের সৃষ্টি করেছে।

"কী? খুব ব্যথা?"

ঘরের এককোণ থেকে পরিচিত অদ্ভুত স্বরটা ভেসে আসতেই, চমকে সেই দিকে তাকাল আলোলিকা। দেখা গেল, টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে নিজের আর মেয়ের ফোটো ফ্রেমটা হাতে দিয়ে একদৃষ্টিতে সেইদিকে তাকিয়ে রয়েছেন মালা সাঁতরা।

মালাকে দেখেই আবার পুরোনো রাগটা ফিরে আসে আলোলিকার। এই মহিলা একজন সাইকিক ক্রিমিন্যাল। মিথ্যে কথা বলে চাকরির টোপ নিয়ে এখানে আলোলিকাকে টেনে এনেছে। নিশ্চয়ই ভয়ংকর কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে। আচ্ছা, এমনটা নয় তো যে ইনিই নিজের মেয়েকে খুন করেছেন? কথাটা ভাবতে ভাবতেই একটা শীতল শিহরণ বয়ে গেল আলোলিকার মেরুদণ্ড দিয়ে। পালাতে হবে... পালাতে হবে এই ঘর ছেড়ে। কিন্তু কীভাবে? সে কিছু করার মতো অবস্থায় নেই। সামান্য নড়তে গেলেও মাথাটা টলছে। আঘাতটা জোরেই লেগেছে বেশ। একটু বিশ্রাম দরকার। বিশ্রাম না নিলে সে এখান থেকে পালাতে পারবে না। আর সে এটা পারবে, যদি একে কোনোরকমে কথায় ভুলিয়ে রাখা যায়।

আলোলিকা ক্ষয়িষ্ণু স্বরে বলে উঠল, "সে নিয়ে আপনায় ভাবতে হবে না। আগে বলুন, আমায় এখানে এভাবে আনার মানেটা কী?"

"তোমায় তো আগেই বললাম, তোমায় আনা হয়েছে, যাতে আমার মেয়ে খেলতে পারে। খেলার সঙ্গী পায়।"

"চুপ করুন! এখনও বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলছেন?"

"গল্প বলছি?"

"হ্যাঁ, গল্প বলছেন। মিথ্যা বলছেন। শুনুন, আমি আপনার সব জারিজুরি বুঝে গিয়েছি। আপনি একজন মিথ্যেবাদী মহিলা। মিথ্যে বলে পুরো গল্পটা বানিয়েছেন। আর এখনও বানাচ্ছেন।"

মালাদেবী নিষ্প্রাণ দৃষ্টিতে একবার তাকালেন আলোলিকার দিকে। কিন্তু কোনো উত্তর দিলেন না।

"দেখুন, আমি জানি না আপনার কী উদ্দেশ্য। আপনি কেন আমায় এখানে ডেকে এনেছেন? আর কেনই বা এখানে আটকে রেখেছেন?" কথাটা বলতে বলতেই একটা গলা-ভেজা কান্নার ঢেউ বেরিয়ে এল আলোলিকার গলা ঠেলে—"আমার একটাই অনুরোধ, আপনি আমায় সত্যিটা এবার অন্তত বলুন। প্লিজ।"

মালা সাঁতরা ফোটো ফ্রেমটা যথাস্থানে রেখে আলোলিকার দিকে ফিরলেন।

"সত্যি শুনবে? শুনতে চাও?"

"হ্যাঁ, আমি সত্যিটা শুনতে চাই। পুরোটা। আজ কোনো মিথ্যা নয়। আজ কোনো লুকোনো কথা নয়।"

আলোলিকা লক্ষ করল মালাদেবীর ঠোঁটের কোণে একটা মুচকি হাসি। তিনি ধীরপায়ে ঘরের একপাশে রাখা একটা কাঠের চেয়ারে বসলেন। লণ্ঠনের হালকা আলো তার মুখের একপাশ আলোকিত করছে। অদ্ভুত ভয়ংকর দেখতে লাগছে ওঁকে।

"আমি কাউকে আমার কাজের কৈফিয়ত দিই না। কারণ জানানো তো অনেক দূরের কথা। কিন্তু মিস রায়, তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে। তাই তোমায় জানাব সবটা। অবশ্য তাতে তোমার খুব একটা লাভ হবে না। কারণ এই কথাগুলোর কিছুই আর তোমার মনেও থাকবে না।"

কথাটা বলে ঘরের অন্ধকার কোণের দিকে তাকালেন মালাদেবী, তারপর আবার হিসহিসে স্বরটা পুরো ঘরে ছড়িয়ে বলে উঠলেন নিজের কথা—"আজ থেকে বছর তেরো আগে আমার স্বামী মারা যান। তার আগে চোরাচালান আর অবৈধ ব্যাবসা করে লোকটা প্রচুর টাকা উপার্জন করে। আমার সেইসব ব্যাবসা নিয়ে কোনোকালেই খুব একটা মাথাব্যথা ছিল না। গরিব ঘরের মেয়ে ছিলাম আমি। দিনের শেষে আমি ভালো খেতে, পরতে পারতাম। আর কী চাই?

"তবে এইসব খাওয়া-পরার বিনিময়ে আমায় মুখ বুজে সহ্য করতে হত মার। এইসব মারের সবসময় কারণ যে থাকত তা নয়। কারও ওপরে রাগ হয়েছে, আমায় মারত। ব্যাবসায় কেউ ক্ষতি করেছে, বাড়ি ফিরে আমায় মারত। কেউ ঠকিয়েছে, আমায় মারত। আসলে মারতে ইচ্ছে হত; মারত। মারার আবার কারণ লাগে নাকি পুরুষদের? লোকটাকে খুব ভয় পেতাম। ওর চোখজোড়ার দিকে তাকালেই বুকের ভেতরটা শুকিয়ে আসত আমার। মনে হত, এই বুঝি পায়ের জুতো খুলে আমায় মারলো, এই বুঝি চুলের মুঠি ধরে দেওয়ালে মাথা ঠুকে দিল, এই বুঝি হাতটা চেপে ধরল গরম কড়ায়ের উপর। সবসময় একটা আতঙ্ক চেপে ধরে রেখেছিল আমায়। কিন্তু যতই হোক, আমার স্বামী তো, দীর্ঘদিন একসঙ্গে থাকতে থাকতে কোথাও গিয়ে আমি তার এই মারগুলোতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম।

"আমার মেয়ে আমাদের অনেক বয়সের সন্তান। অনেক সাধ্যসাধনা করে অনেকটা বয়সে এসে আমার বাচ্চা হয়। পরের দিকে এসে স্বামীর মারের পরিমাণ কমে গেলেও তার প্রতি আমার ভয়টা খানিকটা আতঙ্কের আকারেই আমার মনের গহিনে চেপে বসে থাকল। তাই চেয়েও কখনো সহজ হতে পারিনি লোকটার কাছে। আমার সবটাই জুড়ে ছিল আমাদের মেয়ে। আমার স্বামী ওর ব্যাবসা নিয়ে থাকত আর আমি থাকতাম আমার সংসার আর মেয়ে নিয়ে।

"বেশি বয়সের সন্তান বলেই হোক বা মাতৃত্ব থেকেই; মেয়েকে আমি কাছছাড়া করতাম না প্রায়। মোটামুটি এরকম করে দিন কাটছিল আমাদের, ঠিক এমন সময় একবার খুব বড়ো কোনো একটা কেসে ফেঁসে গিয়ে আমার স্বামী বেশ কিছু জমানো টাকা নিয়ে গা-ঢাকা দেয়। গা-ঢাকা দিতে দিতে যখন এখানে-ওখানে ঘুরছে, ঠিক সেই সময় কারও মারফত আমার স্বামী খবর পেয়ে এখানে, এই হুরাতে আমাদের নিয়ে চলে আসে। তারপর এক ব্রিটিশ অফিসারের পুরোনো বাড়ি কিনে সারাই করে আমরা নতুন করে জীবন শুরু করি। এর মাঝে অবশ্যই আমরা পুরো পরিবার মিলে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করি, যাতে আমাদের নামগুলো আগে-পরে কিছুটা পরিবর্তন হয়ে যায়। তুমি এটাকে গা-ঢাকা দিয়ে থাকার কৌশলও বলতে পারো।

"মোটামুটি নিশ্চিন্তেই কাটছিল দিনগুলি, কিন্তু কথায় বলে, সুখ বেশি দিন সহ্য হয় না। একদিন সদরে গিয়ে লোকটা আর ফেরে না। লোকটা কাছাকাছি না থাকলে ভালোই লাগত। মনে হত না যে ভয়ংকর চোখজোড়া আমায় নিরীক্ষণ করছে। এরকম আগে ও মাঝে মাঝে ফিরত না কয়েক দিনের জন্য। কিন্তু এখানে এসে এই প্রথমবার লোকটা ফিরল না। একটু হলেও দুশ্চিন্তা যে হয়নি তা নয়। পরের দিন জানা যায়, পূর্বশত্রুর হাতে গুমখুন হয়েছে সে। পুলিশ

লাশ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য আমাদের খোঁজ শুরু করে, কিন্তু আমি সচেতনভাবে নিজেকে আড়ালে রাখি। কে বলতে পারত, পরিচয় প্রকাশ করলে পূর্বশত্রুর হাতে আমরাও গুমখুন হতাম কি না?

"মেয়ে তখন তিন বছরের। নিজেকে এই আড়াল রাখার প্রক্রিয়া ভালোই চলছিল, কারণ মেয়ের বাবার দৌলতে আমাদের টাকাপয়সার অভাব ছিল না। আমার সমস্ত মনোযোগ থাকত আমার মেয়ের ভালো থাকাকে কেন্দ্র করে। মেয়ে ধীরে ধীরে বড়ো হতে শুরু করল। কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম, কোথাও একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে। সারাদিন একলা থাকতে থাকতে বাচ্চা মেয়েটা কেমন একটা হয়ে যাচ্ছিল। এই নির্জন প্রান্তরে সে আর তার মা। আর সপ্তাহে একদিন এসে সবজি আর মশলা বাজার করে দেবে এমন এক আদিবাসী বুড়ি।

"মেয়েটার হাসিকান্নার, আনন্দের, দুঃখের সব সময়ের সঙ্গী বলতে ছিলাম আমি। কিন্তু এত বড়ো বাড়ির কাজ সামলানোর হাড়ভাঙা খাটুনির পর আমারও আর কতটা সময় হত মেয়েটাকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য। বুঝতে পারি, মেয়েটা অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। জেদি, একগুঁয়ে, একরোখা। সঙ্গীহীনতায় মানসিক বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। কী করি, কী করি? কী করলে মেয়েটা ভালো থাকবে? কী করলে মেয়েটা সুন্দর স্বাভাবিক জীবন আর বন্ধু পাবে খেলার, গল্প করার, পড়ার—এসব ভাবতে ভাবতে যখন আমার প্রায় পাগলপারা অবস্থা, ঠিক তখনই আমার মাথায় এই অনাথ আশ্রম খোলার প্ল্যানটা চলে আসে।

"আমি বুঝতে পারি, অনাথ আশ্রম খুললে মেয়ের খেলার সঙ্গীর অভাবও হবে না, আর আমায় বাড়ির কাজ সামলানোর ঝক্কিও পোহাতে হবে না। বাচ্চাদের দিয়েই বাড়ির কাজটা সামলে নেওয়া যাবে। কিন্তু যা ভাবা হয় আর যা হয়, তার মধ্যে বিস্তর ফারাক থাকে। যত সময় যায়, মেয়ের বয়স বাড়তে থাকে। আর আমি বুঝতে পারি আমার মেয়ে ঠিক ওর বাবার প্রতিরূপ। কারণে-অকারণেই বাচ্চাদের মারধর করত। ঠিক ওর বাবা যেমন আমায় মারত। ওই সময় আমার মেয়েকে যে কী ভয়ংকর হিংস্র লাগত, কী বলব! আমি যেন ওই সময় ওকে নয়, ওর বাবাকে টের পেতাম। হয়তো আমার মনের ভুল, কিন্তু বিশ্বাস করো, টের পেতাম। আর টের পেতাম বলেই আমি আমার মেয়েকে ভয় পেতাম।"

"ভয় পেতেন?" আলোলিকা ভয় পেয়ে ঢোঁক গিলে ফেলল।

"হ্যাঁ, আমি আমার মেয়েকে ভয় পেতাম। কী? বিশ্বাস হচ্ছে না তো? জানি হবে না। যে শুনবে, সে-ই বিশ্বাস করবে না। কিন্তু এটা সত্যি, আমি আমার মেয়েকে ভয় পেতাম। আজ পর্যন্ত কখনও কোনো মা-কে বলতে শুনেছ এই কথা? শোনোনি... শোনোনি। অথচ আমি এখন একবর্ণও মিথ্যে বলছি না। আমি সত্যি আমার মেয়েকে ভয় পেতাম। ওইটুকু বাচ্চা মেয়ে, যাকে আমি নিজের গর্ভে ধরেছি, দশ মাস ধারণ করেছি, যাকে বুকের দুধ খাইয়ে বড়ো করেছি, তাকে আমি ভয় পাচ্ছি। ভয় পাচ্ছি, কারণ ওর চোখজোড়া অবিকল ওর বাবার মতো দেখতে ছিল। আকাঙ্ক্ষিত কোনো কিছু না পেলেই ও এমনভাবে আমার দিকে তাকাত যে আমার বুকের জল ভয়ে শুকিয়ে আসত। মনে হত, ওর বাবা যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আর আগেই বলেছি, আমি ওর বাবার চাহনিকে ভয় পেতাম।

"তাই সবসময় আমি চেষ্টা করতাম, ও যা চাইছে তা-ই এনে দিতে। সবসময় একটা ভয় কাজ করত, এই বুঝি মেয়েটা রেগে ওঠে, এই বুঝি ওর ভেতরে আমি ওর বাবার ছায়া দেখতে পাই। রেগে গেলে আমি ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকি। এত ভয় পেতে থাকি যে ও রেগে গেলে আমি ওর কাছে যেতে ভয় পেতাম। ভাবতে পারো, আমার নাড়ি-ছেঁড়া ধন, যাকে আমি কোলেপিঠে মানুষ করেছি, তাকে আমি ভয় পাচ্ছি?

"পৃথিবীর সব মা চায় তার সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ঘুমোতে, কাছছাড়া না করতে, কিন্তু আমার কপাল দ্যাখো। যখনই মেয়ের কাছে যেতে চাইতাম, ঠিক তখনই দু-জোড়া চোখ আমার সারা শরীর যেন পাথর করে দিত। আমার মেয়েকে আদর করতে দিত না। কাছে ঘেঁষতে দিত না। চেয়েও আমি কিছু করতে পারতাম না। নিজের সন্তানের থেকে এই দূরত্ব পৃথিবীর যে-কোনো মায়ের জন্য অভিশাপ। তা-ই না?" কথাটা বলতে বলতেই মালাদেবী ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

"তারপর?" কান্নার বেগ কিছুটা কমতেই আলোলিকা প্রশ্নটা করে উঠল।

"তারপর আর কী, আমি নির্দ্বিধায় তা-ই করতাম যা আমার মেয়ে চাইত। সত্যি কথা বলতে, এই করে যাওয়ার মধ্যে মাতৃস্নেহ আর সন্তানের প্রতি ভালোবাসা যতটা ছিল, তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি ভয় ছিল। এমনি করেই দিন কাটছিল। আমি চাইছিলাম, এইরকম করেই যেন দিন কাটতে থাকে। কিন্তু আমরা যা চাই তা তো সবসময় তা হয় না। বাচ্চাগুলো এত বদমাশ ছিল যে কী বলব। কিছুতেই আমার মেয়ের সঙ্গে খেলতে চাইত না। বলত নাকি আমার মেয়ের কাছে যেতে ভয় লাগে ওদের। কিন্তু তা বললে চলবে কেন? ওদের তো ভয় পেয়ে আমার মেয়ের থেকে দূরে থাকার জন্য

এখানে আনা হয়নি।"

"কত মারতাম, ধমকাতাম, একবেলা না খাইয়ে দিয়ে রাখতাম ওদের, কিন্তু তারপরেও ওরা শোধরাত না। মানছি, মানছি, আমার মেয়েটা বদরাগি আর একটু অন্যরকম ছিল। মাঝে মাঝে নানারকম উৎপীড়ন করত, যেমন সাঁড়াশি দিয়ে নখ উপড়ে নেওয়া, রান্নাঘর থেকে খুন্তি পুড়িয়ে এনে বাচ্চাদের খালি পিঠে চেপে ধরা, বা সুচ ফোটাতে চাওয়া, খেলতে খেলতে পাথর মেরে আঙুল থেঁতলে দেওয়া, সিঁড়ি থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া। কিন্তু বিশ্বাস করো, লুকোচুরি খেলতে ভালোবাসত। লুকোচুরি খেলতে চাইলে আর কিছু লাগত না ওর। কিন্তু বাচ্চাগুলো এত বদমাশ ছিল যে কী বলব। মোটেও আসতে চাইত না ওর কাছে। আর তাতে মিনা আরও রেগে যেত।

"আরে তোরা খাচ্ছিস, পরছিস আমার, এদিকে আমার মেয়ের সঙ্গে খেলবি না? উলটে ওকে রাগিয়ে দিবি? খেললে ওর মন ভালো থাকে। তো তোদের পোষা হয়েছিলই বা কীসের জন্য? কিন্তু না, ওদেরকে কিছুতেই যদি রাজি করানো যায়। আচমকা এরকমই একটা সময়ে, একদিন অনাথ আশ্রমেরই একটি ছেলে খেলতে নিমরাজি হওয়ায় ছুঁচ ফোটাচ্ছিল আমার মেয়ে। আচমকা ভয় পেয়ে আমার মেয়েকে ঠেলে ফেলে দিতেই মেয়েটা ডুকরে কেঁদে ওঠে। জানো, আমি সব সহ্য করতে পারি, কিন্তু মেয়ের কান্না সহ্য করতে পারতাম না। কী যে হল, আচমকা ধক করে আমার মাথায় আগুন ধরে যায় যেন। মেয়েকে ভয় পাই ঠিকই, কিন্তু ভালোও তো বাসি, বলো। আমারই আশ্রমের একটি বাচ্চা আমারই মেয়েকে ঠেলে দেবে—এটা সহ্য হয় বলো?

"তো তাকে এমন মারি, এমন মারি যে সে প্রায় মরেই যেতে বসেছিল। পরে ছেলেটি কোনোক্রমে বেঁচে গেলেও খবরটা বাইরে চাউর হয়ে যায়। যে আদিবাসী বুড়ি এখানে সপ্তাহের একদিন বাজার দিতে আসত, সেদিন সে সবটা দেখে চারিদিকে রটিয়ে দেয়। এমনিতেই এখানকার লোকেদের আমার ওপর রাগ ছিল। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই যেন চারিদিকে অশান্তির আগুন জ্বলে ওঠে। তারপরেই থানাপুলিশ হয়। অনেক টাকা খরচ করতে হয় এই কেসটা বন্ধ করার জন্য। তারপর একটা সময় কেস ক্লোজ হয় ঠিকই, কিন্তু অনাথ আশ্রম থেকে বাচ্চাদের সরিয়ে দেওয়া হয়।

"বাচ্চাদের সরিয়ে দেওয়ার পর আমার মেয়ে খেলার সঙ্গী না পেয়ে মনমরা হয়ে যেতে থাকে। সবসময় খেলার সঙ্গী হাতড়ে বেড়াতে থাকে নিঃসঙ্গ বাড়ির আনাচকানাচে। আমি চেষ্টা করি ওকে লুকোচুরি খেলায় সংগত দিতে, কিন্তু একলা আমি কত পারি। তারপর এত বড়ো বাড়ির এত কাজ। নিঃসঙ্গতায় আর একাকিত্বে দেখতেই দেখতে মেয়ের শরীর ভাঙতে শুরু করে। জানো, তারপর মাত্র তিন দিনের জ্বরে মেয়েটা আমায় ছেড়ে চলে যায়। এই তিন দিন জ্বরে বেহুঁশ থাকতে সে শুধু অনাথ আশ্রমের ছেলেমেয়েদের খুঁজত। আর লুকোচুরি খেলতে চাইত। তারপর তার সাত বছরের জন্মদিনের দিন মেয়েটা হঠাৎ আমার কোল শূন্য করে চলে যায়।"

"এরপর...?"

"এরপর... আমি আর এই বাড়িতে থাকতে পারি না। না থেকে সদরের দিকে একটা বাড়ি কিনে থাকতে শুরু করি। মাঝে মাঝে আসতাম, কিছুক্ষণ থাকতাম, তারপর চলে যেতাম। কিন্তু যখনই আসতাম, বুঝতাম আমার মেয়ে ভালো নেই। মারা যাওয়ার পরেও ও একা। ওর বন্ধু দরকার। ও বন্ধু চায়। বন্ধুদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে চায়। তাই ঠিক করলাম, আবার এই অনাথ আশ্রম চালু করব। কিন্তু পূর্বের অভিজ্ঞতায় কেউ আর বাচ্চা রাখতে চাইল না এখানে। ঠিক সেই সময় এমন একটা ঘটনা ঘটল, যা আমায় পুরো ঘটনাগুলোকে নতুন করে ভাবতে শেখায়।"

"কী ঘটনা?"

"সম্ভবত মেয়ের জন্মদিনের আগে, অনেক কষ্টে পাশের গ্রামের একটা মেয়েকে রাজি করিয়ে এই বাড়িতে নিয়ে আসি। উদ্দেশ্য ছিল, জন্মদিনের আগে ঘরদোর একটু পরিষ্কার করা। আর তেমন পছন্দ হলে ওকে কাজের লোক হিসেবে রেখে দেওয়া। কিন্তু বাড়িতে মেয়েটিকে নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমি বুঝতে পারি, আমার মিনা যেন মেয়েটির আগমনে খুশিই হয়েছে। সে আকারে-ইঙ্গিতে মেয়েটিকে খেলার সঙ্গী হওয়ার প্রস্তাব দিতে থাকে, কিন্তু মেয়েটি রাজি না হয়ে ঠিক তোমার মতো ভয় পেয়ে এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ভাবে। আমি বুঝতে পারি, আমার মেয়ে রেগে যাচ্ছে এই প্রত্যাখ্যানে। কিন্তু আমার কী-ই বা করার ছিল?

"এরপর ঠিক তার তিন দিনের দিন গভীর রাত্রে আমি বুঝে যাই যে আর যা-ই হোক, আমার মেয়ের খেলার সঙ্গীর অভাব হবে না। আমার মেয়ে যে মৃত্যুর দরজা পেরিয়েও আবার ফিরে এসেছে শুধু তার প্রিয় লুকোচুরি খেলা খেলবার জন্য; সে ঠিক নিজের মতো করে নিজের খেলার সঙ্গী জোগাড় করে নেবে। তার শুধু দরকার একটু সাহায্য, তার মায়ের থেকে...। আর মা এটুকু করবেই।

"জীবিত অবস্থায় তার মা তাকে খেলার সঙ্গী এনে দিতে

পারেনি, কিন্তু মরণের পরে ঠিক পারবে, পারতেই হবে... সে তার খেলার সঙ্গী পেয়ে গিয়েছে। সে ভালো আছে। কিন্তু একজন সঙ্গী পেয়ে কি তার মন ভরে? মানুষের রক্ত মুখে লাগলে যেমন বাঘের অন্য কিছু রোচে না, তেমন যার একাধিক খেলার সঙ্গীতে অভ্যাস, সে কি একটা সঙ্গী পেয়ে ক্ষান্ত থাকবে?

"স্বভাবতই সে আমায় দাবি জানাতে লাগল আরও খেলার সঙ্গী জোগাড় করে দেওয়ার। কিন্তু বললেই তো আর খেলার সঙ্গী জোগাড় হয় না। কিন্তু ওই যে, মায়ের মুখ থেকে না-শোনার অভ্যাস তার নেই। সময় যত গড়াতে লাগল, ততই তার রাগ বাড়তে লাগল আমার ওপর। আমি কেন এনে দিতে পারছি না তার খেলার সঙ্গী, এ যেন আমার অপরাধ। ঠিক তখনই আমার মাথায় একটা ভয় জাঁকিয়ে বসে, সঙ্গীর অভাব পূরণ করতে গিয়ে ওই কাজের মেয়েটির মতো আমাকে যদি আমার মেয়ে খেলার সঙ্গী বানিয়ে নেয় চিরদিনের জন্য তাহলে? এইরকম ভয়ে বিপর্যয়ে যখন আমার প্রায় নাস্তানাবুদ অবস্থা, ঠিক সেই সময় আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। যার ফলে না আমায় আমার মেয়ের খেলার সঙ্গী হতে হবে, আর না আমার মেয়ের খেলার সঙ্গীর কোনো অভাব থাকবে।"

"বুদ্ধি? কী বুদ্ধি...?"

বিস্ময়ে আলোলিকার মুখ থেকে কথা সরছে না।

"কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে চাকরির টোপ দেখিয়ে লোক আনানোর..." কথাটা বলেই একটা কুটিল চোরা হাসি খেলে গেল মালা সাঁতরার ঠোঁটের কোলে। একটু আগের সেই মাতৃস্নেহে কাতর মহিলার সঙ্গে এই মহিলার মুখের ভাবের কী ভয়ানক আকাশ-পাতাল পার্থক্য!

আলোলিকার মনে হল, কে যেন তার পা-জোড়া টেনে মাটির মধ্যে গেঁথে দিয়েছে।

কোনোরকমে ঘড়ঘড়ে গলায় জিজ্ঞেস করে উঠল, "মানে?"

"মিনা তাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে চায়, কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউই রাজি হয়নি। মেয়ে আমার এমনিতে ভালোই, কিন্তু রেগে গেলে সামলানো মুশকিল। মারা যাওয়ার আগে তিন দিন জ্বরের ঘোরে শুধু বলত, 'লুকোচুরি খেলবে?', 'দেখতে পেয়ে গেছি', 'টুকি' তাই এখনও সে তিন দিনের অপেক্ষা করে। খেলতে চাইলে ভালো, না চাইলে মেয়ে তাকে নিজের পছন্দমতো গড়েপিটে নেয়...।"

"চুপ করুন।" প্রবল রাগে চিৎকার করে থরথর করে উঠে দাঁড়াল আলোলিকা, "মিথ্যেবাদী, ধাপ্পাবাজ মহিলা কোথাকার! ইয়ারকি পেয়েছেন? সাইকো মেয়ের গল্প শোনাচ্ছেন? আপনাকে আমি আবার জেলে দেব। মিথ্যে চাকরির টোপ দিয়ে আপনি লোক ঠকান। তারপর তার ওপরে আশ্রমের বাচ্চাদের মানসিক নির্যাতন করেন। এখন বুঝতে পেরেছি, ইন্সপেকশনে কোনো সরকারি অফিসার আসে না। হাজারটা মিথ্যের মতো এটাও একটা মিথ্যে। আসলে... আসলে আপনি একজন ক্রিমিন্যাল মাইন্ডেড সাইকো মহিলা। আপনি আর আপনার মেয়ে দুজনেই বদ্ধপাগল। আমি এক্ষুনি এই বাড়ি ছেড়ে..."

আলোলিকার কথা শেষ হল না, তার আগেই একটা বিশ্রী খিকখিকে হাসি বেরিয়ে এল মহিলার গলার ভেতর থেকে। চমকে উঠল আলোলিকা, অবিকল সেই হাসি। যে হাসি তিন দিন তাকে বিভীষিকার মতো তাড়া করে বেরোচ্ছে।

"কোথায় যাবে?" মালা সাঁতরার লম্বা মুখে সেই বিশ্রী হাসিটা ঝুলছে। কী বীভৎস লম্বা লাগছে ওই রোগা শরীরটা। যেন মাথাখানা ছাদে ঠেকে যাবে।

"কোথাও যেতে পারবে না। না এর আগে কেউ পেরেছিল। না তুমি পারবে। প্রত্যেক বছর আমি আমার মেয়ের জন্মদিনে তোমার মতো একজনকে আনি। বিগত অনেক বছর ধরে তা-ই করে আসছি তো। আমি আনতে বাধ্য। যদি আমি প্রত্যেক বছর ওর জন্মদিনে নতুন খেলার সঙ্গী না জোগাড় করি, তাহলে ও আমায় নিজের খেলার সঙ্গী বানিয়ে নেবে। আমার মেয়ের খেলার সঙ্গী চাই, বুঝলে...। খেলতে হবে তো। লুকোচুরি খেলবে না আমার মেয়ের সঙ্গে? তোমরা লুকোবে। আমার মেয়ে খুঁজবে। তোমরা বলবে টু...কি। আমার মেয়ে বলবে..."

"ধা...প্পা!"

আচমকা কানের পেছনে একটা শীতল স্বরে আপাদমস্তক শিউরে উঠল আলোলিকা। চমকে উঠে ঘাড় ঘুরিয়ে যা দেখল আলোলিকা, তাতে প্রবল আতঙ্কে পেটের ভেতরটা আচমকা খালি হয়ে গেল। গলার ভেতর থেকে আপনা থেকেই বেরিয়ে এল একটা গোঙানির আওয়াজ।

একটা কালো শরীর ঠিক তার মুখের সামনেই ঝুলছে। ছাদের কার্নিশ থেকে বাদুড় যেমন উলটো হয়ে ঝোলে, এ-ও ঠিক তেমনই। সেদিন দোতলার বারান্দার রেলিং থেকে ঝুলতে এই মুখ এর আগেও দেখেছে আলোলিকা। সেই দোতলার রেলিং থেকে যে মুখটা কাল রাতে ওর দিকে তাকিয়ে ছিল, এই সেই মুখ। একতাল মাংসপিণ্ড যেন। সেই মাংসপিণ্ডে মুখ, নাক, কান কিছুই নেই। চোখের বদলে রয়েছে দুটো সাদা মাংসপিণ্ড আর তার ওপর গোলমরিচের

দানার মতো দুটো কালো বিন্দু। উফ! কী ভয়ংকর এই মুখ! কী ভয়ংকর এই চোখজোড়া।

আলোলিকার সারা শরীর ভয়ে-আতঙ্কে থরথর করে কাঁপছে। এ কী দেখছে সে? এ কাকে দেখছে চোখের সামনে?

পলকের মধ্যেই ঝুলতে-থাকা শরীরটা হাওয়ায় একটা ভল্ট দিয়েই আলোলিকার মুখোমুখি দাঁড়াল। পেছন থেকে মালা সাঁতরার ওই অদ্ভুত হাসি তখনও ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে। কিন্তু আলোলিকার চোখ সামনের থেকে সরছেই না। দুটো সাদা মাংসপিণ্ডে যেন অদ্ভুতভাবে বশীভূত হয়েছে আলোলিকা। তার নড়ার ক্ষমতা নেই, তার সরার ক্ষমতা নেই, তার যেন কিছুই করার ক্ষমতা নাই। আলোলিকা দেখছে, ওই ভয়ংকর জিনিসটা মালা সাঁতরার হাসির তালে তাল মিলিয়ে সামনে-পিছনে ঝুঁকে একটু দুলছে যেন। তারপর আচমকাই সোজা দাঁড়িয়ে দুটো কালো কালো হাত দিয়ে সাদা মাংসপিণ্ডটা এইভাবে আড়াল করল যেন চোখ দুটো ঢাকা দিয়েছে সে। তারপর ধীরে ধীরে ঘাড়টা একদিকে কাত করে সেই অবস্থায় বলে উঠল, "টু...কি!"

সঙ্গে সঙ্গে মালা সাঁতরা চিৎকার করে উঠল, "লুকিয়ে পড়ো আলোলিকা। লুকিয়ে পড়ো... মেয়ে যেন না খুঁজে পায়। কিছুতেই না খুঁজে পায়..."

আলোলিকার মাথা কাজ করছে না। বোধবুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে যেন। সে কী করবে? কী করা উচিত তার? কী করা উচিত? নাহ্, পালাতে হবে এখান থেকে। পালাতে হবে। আলোলিকা এক মুহূর্ত দাঁড়াল না। শরীরের সমস্ত শক্তি জড়ো করে সে ছুট লাগাল সিঁড়ি দিয়ে। এই ঘর, এই বাড়ি, এই তল্লাট ছেড়ে পালাতেই হবে। যে করেই হোক পালাতেই হবে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে আলোলিকা ছুটল মেন দরজার দিকে... আঁতকে উঠল আলোলিকা। এ কী! মেন দরজা খুলছে না কেন? কে যেন বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়েছে।

সিঁড়ির ওপর থেকে চিৎকার করে উঠলেন মালা সাঁতরা, "পালিয়ে কোথাও যেতে পারবে না আলোলিকা। তার চেয়ে লুকিয়ে পড়ো... লুকিয়ে পড়ো। আমার মেয়ে আজকে খেলবে তোমার সঙ্গে। খেলবে। আর এই খেলাতে তোমায় জিততেই হবে। না হলে... খিক খিক খিক!" তারপরেই সেই বিশ্রী খিলখিলে হাসিটা। কী করবে? কী করবে আলোলিকা এখন? ঠিক তখনই তার দৃষ্টি গেল তার রুমে যাওয়ার করিডোরের মুখে। করিডোরের মুখে এখনও লন্ঠনের আলোগুলো জ্বলছে। এক মুহূর্ত দেরি না করে আলোলিকা ছুটল সেইদিকে...

কিন্তু করিডোরে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই একটা একটা করে আলো যেন আপনা থেকেই নিভে যেতে লাগল... আলোলিকার মনে হচ্ছে, সে যেন মাথা ঘুরে এখুনি পড়ে যাবে। কিন্তু তার তো পড়লে চলবে না। তাকে বাঁচতে হবে। বাঁচতেই হবে। পেছন থেকে ভেসে আসছে মা-মেয়ের রক্ত-জল-করা খিলখিলে হাসিটা। আলোলিকা দেখতে পাচ্ছে, শেষ লন্ঠনের আলোটা নিভে যাচ্ছে। তার আগে কোনোরকমে শরীরটাকে নিজের ঘরে ঢুকিয়ে ফেলতে হবে তাকে। ঘরে ঢুকলে যদি বাঁচা যায়... কিন্তু বোকা মেয়েটা জানে না, এই লুকোচুরি খেলা থেকে তার আর মুক্তি নেই। কিছুতেই নেই। তাকে রোজ রাতে ধরা পড়তেই হবে এর হাতে। আর রোজ রাতে শুনতে হবে, "ধা...প্পা!"

* * * * * * * *

দোতলার দেওয়ালে ঘণ্টাটা ধরে নাড়াতেই টুংটাং করে মিষ্টি শব্দটা ছড়িয়ে পড়ল সারা বারান্দা জুড়ে। পাশে দাঁড়িয়ে-থাকা মেয়েটি ঘাড় ঘুরিয়ে ঘরের নানান দিকে চোখ ফেরাচ্ছিল।

মালা সাঁতরা মুচকি হেসে বললেন, "মিস দাস, রাতের বেলা কোনো দরকার পড়লে অনেক সময় ওরা এই ঘন্টিটা বাজায়। খেয়াল রাখবেন।"

পাশে দাঁড়ানো মেয়েটা মাথা নাড়াল। ঠিক এমন সময় দোতলার ঘরের দরজাগুলো খুলে একে একে বাইরে বেরিয়ে এল জনা সাতেক ছেলেমেয়ে। তারা সবাই বারান্দার একপাশে লাইন দিয়ে দাঁড়াল।

"ও হল মিলি, ওর পাশে রত্না, আর ও হল শ্যামা।" মালাদেবী তিনটে মেয়েকে দেখিয়ে বললেন, "ওরা এক ঘরে থাকে। ওদের পাশে সঞ্জয় আর বিমল। ওরা এক ঘরে থাকে।" কথাটা শেষ করেই তিনি দুটি বাচ্চা মেয়ের দিকে আঙুল তুলে বললেন, "ও হল রিমি। ও ওই ডানদিকের ছোটো ঘরে থাকে। আর ও হল এখানকার সব চেয়ে ছোটো মেয়ে। ও রিমির সঙ্গে এক ঘরেই থাকে।"

মিস দাস ধীর পায়ে এগিয়ে গেল বাচ্চা মেয়েটির কাছে। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে, মুচকি হেসে সে প্রশ্ন ছুড়ল মেয়েটির দিকে, "কী নাম তোমার?"

উত্তরে ছোট মেয়েটি কিছু বলতে যাবে তার আগেই পেছন থেকে মালা গোমস বলে উঠলেন, "ওর ভালো নাম আলোলিকা। তবে আমরা ওকে ভালোবেসে আলো বলে ডাকি। আপনিও ওকে ওই নামেই ডাকবেন কেমন?"